# মার্ডারারের মা

অণিমা প্রকাশনী
১৪১, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ :  ১৯৬১ জুন

প্রচ্ছদ :  চারু খান

প্রকাশক : শ্রীদ্বিজদাস কর, অণিমা প্রকাশনী ; ১৪১, কেশবচন্দ্র সেনস্ট্রীট, কলকাতা ৯

মুদ্রণ : শ্রীসুকুমার দে, বাসন্তী প্রেস, ১৯ এ, ঘোষ লেন, কলকাতা ৬

## ॥ এক ॥

রাত এগারটা বেজে গেলে রানী চোখ খুলে রাখতে পারে না। খালি খালি ঘুম পায় ওর। কিন্তু এই ব্যারাকবাড়িতে এত তাড়াতাড়ি রানীদের ঘুমোতে দেয় না কেউ। ঝলমলে ম্যাক্সি বা কুর্তা-পাজামা বা বম্বের অভিনেত্রীদের মডেলে ড্রেস পরে বসে থাকতে হয়, থাকতেই হয়। তারপর খুলতে হয়। এতবার খুলতে হয়, এতদিন ধরে। কেন রানীদের এমন করে নগ্ন হতে হয় অনাদিঅনন্তকাল ধরে, তা রানী জানে না। কে জানে?

উত্তর চব্বিশ পরগনার এ শহরটা কলকাতার খুব কাছে। আর এই ব্যারাকবাড়িটা শহরের এমন একটা জায়গায়, যেখানে ঢোকা যায়, বেরোনো যায় না। বাকি শহরটা যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন এ বাড়ি ভীষণ রকম জাগ্রত। পাঁচটা জায়গায় ভি ডি ও চলে সারা রাত। এই ব্যারাকবাড়িতে একটি চুল্লুর ঠেক, একটি ড্রাগের ঠেক আছে। আর আছে রানীরা।

এ একটা সাম্রাজ্য, যা থেকে অনেক রাজস্ব ওঠে। এ সাম্রাজ্যের সম্রাট হলো টাইগার। এখানে সম্রাট মরলে তার ছেলে সম্রাট হয় না। আরেকজন আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে, সে প্রাচীন সম্রাটের সঙ্গে রীতিমত যুদ্ধ করে দখল নেয়। হাতকাটা দীনু এ সাম্রাজ্য গড়েছিল কংরেস আমলে। দীনুর অনেক গল্প এখনো শোনা যায়। সে নাকি নেতাজী দিবসে বস্তির শিশুদের দিয়ে কুচকাওয়াজ করাত। মোটর সাইকেল, অ্যামবাসাডর, সব থাকতেও সে সাইকেল রিকশায় ঘুরত। ব্যারাকবাড়ি তারই, মেয়েদের মালিকও সে। তবু ছবিকে ও ছেড়ে দিয়েছিল।

রানীরা মাসির সঙ্গে বসে মাঝে মাঝে গল্প করে। ছবির গল্পটি শুনতে রানী বড় ভালবাসে।

ছবি ছিল নতুন মেয়ে, তখনো পোক্ত হয়নি কারবারে। মাসি বলে, ছবির গায়ে মাঠঘাটের গন্ধ ছিল, আর সে নাকি খুব কান্না-কাটি করত।

—সে ছাড়া পেল কি করে?

—সে এক আশ্চর্য কথা।

—কি হয়েছিল গো?

দীনু তখন রাত দশটায় মাসির ঘরে বসত মদ খেতে। এখানে সে একটা রাতও কাটাত না। রাত যত হোক, টাউনে থাকলে ও বাড়িতে ফিরবেই ফিরবে। দীনুর বাড়িও টাউনেই। লাইনের ওপরে। পৈতৃক বাড়ি ছিল, সুন্দরী বউ ছিল, ছেলে ছিল। দীনু বডিগার্ড রাখত, রাখতে হয়। ইরানী ছিল ওর বডিগার্ড। সেদিন প্রত্যেক দিনের মতোই মদ খেয়ে দীনু এগারোটায় বেরোচ্ছিল। ছবি খদ্দের বিদায় করে নিজের দরজায় দাঁড়িয়েছিল। দীনু বেরোতে গিয়ে ছবির গায়ে জুতোর ঠোকর দিয়েছিল আর হঠাৎ বলে ফেলেছিল, কে মা? দেখতে পাইনি, লেগে গেল।

মাসি হেসে ফেলেছিল, কাকে "মা" বলচো গো বাবু? ও তো ছবি, সেই চাঁপবেড়ের মেয়েটা। যাকে নিয়ে বৈশেখে এত হাঙ্গামা হলো। যে বারে বারে পালিয়ে যেতে চায়।

ছবি দাঁড়িয়ে কাঁপছিল। "দীনুবাবু" নামটা শুনলেই ভয়। দীনু গর্জন করলে নাকি পোয়াতির অকাল-প্রসব হয়ে যায়। মানুষকে ডেকে দাঁড় করিয়ে ও চেম্বার চালায়। ছবি কাঁপছিল, চোখ থেকে জল পড়ছিল।

দীনু দু-তিন বার মাথা ঝেঁকে মাথা সাফ করেছিল। সে দিনটা নাকি ওর পয়মন্ত দিন। জেদের বশে লাকসারি ট্যাকসির গ্যারেজ কিনেছিল। সেদিনই সেটা ভাল মুনাফায় বেচেছে। মনটা ভাল ছিল। দীনু বলল, "মা" বলেচি? জিবে "মা" শব্দ এল কেমন করে? এ নিশ্চই মায়ের ইচ্ছে। পুজো দেবার আগে মাকে বহুত মন দে ডাকছিলুম। দীনুর কেউ নেই মা। দীনু বড় অভাজন। আমি নাকি বংশের মুকে কালি দিইচি। মা! তুমি

তো দেকচ কি চেষ্টাকষ্ট করে ওপরে উটতে হচ্চে। পুজো নাও মা, পুজো নাও। পুজো দিয়েছি, ফুল নিয়েছিল। দৈবকৃপা ছাড়া তো এমন হয় না। নিজের মা কুপুত্তুরের মুক দেকবে না বলে সুপুত্তুর বড় ছেলের কাছে আচে, বউয়ের লাতি খাচ্চে, জম্মে দেকতে যাই না। মনের আঁক পাঁক মনে রেখে দিই। মনে মনে বলি মা! মা! মা! আমার মুক দে অত বড় কথাটা বেরোল? কি বললি? পালিয়েছিল?

—হ্যাঁগো বাবু, দু দু বার।

—যাক গে, বলে যখন ফেলেচি……মা নামের মহিমে তুই কি বুজবি মাগী? ভাতার ছেড়ে লাইনে এসছিলি, গতর যেতে মাসি হইচিস! "মা" বলা যায় মাকে আর মেয়েকে! ওকে "মা" বলেচি যখন, ছেড়ে দেব।

ছবি ডুকরে কেঁদে উঠেছিল।

—ছেড়ে দেবেন, যাবে কোতা? এদ্দিনে বিষদাঁত মরে এসেছিল, পোষ মানছিল……

—চুপ কর।

—যাবে বা কোতা? বাপ-মা নেবে?

—সে ও বুজবে। দেক মেয়ে! ছেড়ে দেব, কাল তোমায় রেলে তুলে দেবে। পুলিশ-থানা করার কতাও ভেব না।

দীনু ছবিকে সত্যিই ছেড়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে এটাও হুকুম-জারি হয়ে যায়, দীনুবাবু যখন ঢুকবে বেরোবে, কেউ যেন দরজায় না থাকে। বাবুর পা আবারও টলে যেতে পারে, আবারও কাউকে "মা" বলতে পারে। "মা" বললে ছেড়ে দিতেই হবে, কেন না "মা" বলার পর তার গতর বেচে পয়সা করা মহাপাপ। "মা" শব্দের মহিমা মস্ত বড়। এমন দুর্ঘটনা একবার হওয়াই ভালো। বারবার হলে কারবারে বাতি জ্বলবে।

মাসি বলে, তা ছাড়া এটা হল কারবার। কারবারের ক্ষেতি হয়ে যেত না?

—সত্যি ছেড়ে দিল?

—আমি নিজে যেয়ে শ্যালদার টিকিট কেটে তুলে দিয়ে এসেছিলাম।

—তারপর কি হলো গো ?

—কে খবর রাখচে ? পানের দোকানের বিলেস বলেছিল, তাকে কোলে বাজারের ফুটপাতে শসা-কলা বেচতে দেখেচে, কে জানবে কাকে দেখেচে ? যাব যাব সবাই বলে। যাবে কোতা ? মা-বাপ ঘরে নেবে ? বে' হবে ? গেলেও বেশির ভাগ তো হেতাহোতা লাইনেই যায়। সব্বত্তর দালাল ঘুরচে। তারা নে' যায়, লাইনে তুলে দেয়।

—তারপর ?

—তারপর আর কি ! কপাল থাকে, আমার মত মাসি হয়ে বসে। নইলে চুলোয় যায়।

নে, ঘুমোতে যা। আমিও একটু শোব। তোর চিন্তে কি ? গতর থাকতে চিন্তে নেই।

যতদিন কংরেস, ততদিনই দীনুর রমরমা ছিল। বোম বাঁধতে বাঁ হাত উড়ে যায়। কিন্তু হাসপাতালে নেতারাও দেখতে এসেছিল, "দীনুবাবু" বলেই কথা বলত। পুলিশের বড় বড় কর্তারা দীনুকে কেস দিত, ধরে রাখতে পারত না।

কংরেস গেল, দীনুও গেল। দীনুকে হঠাল তপন। দীনু বা তপন বা যে কেউ, যে-যার সময়ের রংরুট। তাৎক্ষণিক সময় ও ইতিহাসই এদের রেক্রুট করে, যেমন করে যুদ্ধের প্রয়োজনে সৈনিক রেক্রুট করা হয়। যুদ্ধও তো ইতিহাস রচনা করে, ইতিহাস যেমন যুদ্ধকে তৈরি করে। পশ্চিমবঙ্গে একদিনের গোপাল পাঁঠাদের সময় থেকে গতকালের রমেন মণ্ডল এবং তার পরবর্তী সময়ে, আজ অবধি, তাৎক্ষণিক রাজনীতির ইতিহাসই এদের রেক্রুট করে, হাতে অস্ত্র দেয়। আজকাল অবশ্য এদের প্রয়োজন ভীষণ বেড়েছে। রাজনীতি আর সমাজবিরোধীকে কন্ট্রোল করে না। রাজনীতি আর অপরাধ-শিল্প পরস্পর পরস্পরকে ধারণ করে রাখে। ভারত মানচিত্রে বহু জায়গা এদের দখলে। সমাজবিরোধী ভোটে দাঁড়ায়। জননেতা হয়। জনতা কি মনে করে, সে হিসেব নেয়া হয় না। লেখা হয় না। একদা যখন রাজনীতি এদের কন্ট্রোল করত, সময় নামক ইতিহাস রচয়িতা এদের হাতে তুলে দিয়েছে ছুরি, রিভলভার, পিস্তল, বোমা। এখন দেয় উন্নত আগ্নেয়াস্ত্র, অধিক

শক্তিশালী বোমা। তা বলে প্রাচীন দিনের ছুরি বা ছোরা বাতিল হয়ে যায়নি। নিঃশব্দে ঘাতক হিসেবে ছুরি এখনো খুব প্রাসঙ্গিক বাতিল নয়।

তপন ছিল তার সময়ের রংরুট। নকশাল আন্দোলনে যখন যুবসমাজের একটা বড় অংশ উত্তাল, তার ঠিক পরেই, মহানগরী ও অন্যত্র নকশাল যুবকদের রক্ত নিয়ে রক্তোৎসবের পর, ১৯৭২-এ কংরেস যখন ক্ষমতায় আসে, তার আগেই বেকারি ও হতাশ্বাসে ভাসমান শহরের অর্ধ-শিক্ষিত, সামান্য শিক্ষিত, অশিক্ষিত অরাজনীতিক যুবসমাজ থেকে বেশ কিছু ঘাতককে তৈরি করে নেয়া গেছে। বেশ কিছু সমাজবিরোধী পুলিশের দুশমন নয়, দোস্ত বনে গেছে।

দামের বিনিময়ে।

পুলিশ দিয়েছে টাকা আর এরা দিয়েছে জীবন, সম্ভ্রম, মানুষ নামে বাঁচার অধিকার। নিজেরা আর মানুষ থাকে নি।

যখন বহু নকশাল বাইরেও আছে, জেলেও আছে, তখন কংরেস সরকার ও পুলিশ যুগপত অনেক হাফ-শিক্ষিত, ট্রিগার-হ্যাপি যুবককে রেক্রুট করে। এরা কংসাল। কংরেস সরকারের হয়ে এরা মুখে নকশাল সমর্থক হয়ে নকশাল দলে ঢুকে পড়ে। এদের ওপর নির্দেশ ছিল, বেমক্কা খুনখারাপি করে চলো নির্দোষ মানুষকে, যে হত্যাগুলির পিছনে কোনো যুক্তি পাওয়া যাবে না, এবং যা নকশালদের কাজ বলেই প্রচার পাবে। এটা চালিয়ে গেলে নকশালদের ওপর মানুষের যে শ্রদ্ধা আছে, তা চলে যাবে। তাদেরকে নৃশংস খুনী বলেই প্রচার দেয়া যাবে।

আরেকটা নির্দেশ ছিল। তোমাদেরও ধরা হবে দোষী নকশাল হিসেবে। এবং ওদের সঙ্গে এক জেলেই রাখা হবে। সেখানে তোমরা ওদের বন্ধু সেজে যত পার গোপন কথা বের করবে। জেল ব্রেকের পরিকল্পনা জানতে পারবে, কে কোথায় আত্মগোপন করে আছে তাও জেনে নেবে।

তপন ছিল কংসাল। জেলে নকশালদের ওপর যত মারধোর হোক, কংসালদের গায়ে কখনো লাঠি পড়ত না। এটাও ঠিক যে

নকশালরা কংসালদের চিনতে ভুল করেনি। কংসালদের তারা আমলও দেয়নি। ফলে জেলে কংসালরা খানিকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সাতাত্তরে ছাড়া পেয়ে কংসালদের বিশ্বস্ত সার্ভিসের পুরস্কারস্বরূপ দিকে দিকে ফিট করে দেওয়া হয়। যার যেমন যোগ্যতা, সে তেমন কাজ পায়।

জন্ম থেকে এক হাত ছিনে পড়া ছানু একসময়ে "রাজনীতি কত্তে যেয়ে পুলিশের লাঠিতে এমন দশা'' বলে হাতটি দেখাত। পরে দেখল সে কথা ধোপে টিকছে না। ছানু এরপর বোবা মেরে যায়। জেল থেকে শরীরে স্বাস্থ্যে সেরে ও যখন বেরোয়, ওকে বাজারে মুরগি কাটা ও বেচার কাজ করতে দেখা গেল।

তপন অন্য পর্যায়ের। তার চেহারা সুন্দর, হাসি সুন্দর, দক্ষ নাইফার হিসেবে ওর কদর ছিল। জেলে গিয়েছিল ও নেতাদের নির্দেশে. নেতারাই ওকে টাউনে মলয়ের সঙ্গে ভিড়িয়ে দেন। মলয় দীনুর দলভুক্ত। কিন্তু শুধু একটি চুল্লুর ঠেকে ওর মন উঠছিল না। নিজেকে ও "সোসিত ও বঞ্চিত'' মনে করত। বলত, এগুলো হচ্ছে ছোট জাতকে ঘেন্না। দীনু গাঙ্গুলী বামুন। ও বামুন কায়েত বেছে বেছে ভাল শেয়ার দেয়। আমি তো আসলে রুইদাস-- এস সি। আমাকে দেবে কেন? অথচ লাইপ রিস্ক করে বোম টপকাতে মলয়। সেদিন পাঞ্জাব সিংয়ের সঙ্গে লড়াইটা দেখলে না?

তপন বুঝেছিল, মলয়কে ব্যবহার করে ফেলে দেওয়া কঠিন হবে না।

মলয় বলেছিল, তা ছাড়া দীনুবাবু অনেকদিন লাইনে আছে। দশ বছর হয়ে গেল, আর কত? পেনশানে পাঠিয়ে দাও। এখন আমাদের দিন।

—কাজটা করবে কে?

—আমিই পারি।

—না, পার না। ইরানী ফাইটার।

—চেম্বার চালায় বলে?

—না। ইরানী ডেঞ্জারাস।

—তাহলে? ভাবছ নিজে করবে? তুমি এসেছ, চায়ের দোকানে বসছ, আড্ডা দিচ্ছ। কিন্তু এলাকাটা দীনুবাবুর, সেটা

ভুল না। পলিটিস করেছ? চম্পকও পলিটিস করত। নকশাল ছিল।

—বোক না মলয়। চম্পক আমার সঙ্গে পড়ত।

—হে-হে, সে হলো নকশাল, তুমি হলে কংসাল!

তপনের চোখ নেচে উঠেছিল। হাত চলে গিয়েছিল প্যান্টের পকেটে। মলয়ের পেট লম্বালম্বি চিরে দেয়া খুব সহজ সমাধান। কিন্তু এটাও তপন বুঝেছিল, সহজ বটে, তবে সমাধান নয়। যার সঙ্গে এখনো কোনো দল নেই, তার পক্ষে সমাধান নয়। এতে খোলাখুলি অন্যের হাতিয়ারের সামনে নিজের বুক পেতে দেয়ার কাজ হবে। সে রকম বোকা তপন নয়।

তপন নেহাতই বহুজনের একজন। সময়ের রংরুট মাত্র। ভবানীবাবু ওকে নিয়ে যায় কনক মজুমদারের কাছে। আই পি এস কনক মজুমদার টগবগে ছেলে, ইংরিজি চোস্ত। নকশাল উচ্ছেদে বদ্ধপরিকর। বহু ছেলেকে ও চিরতরে নিখোঁজ করে দিয়েছে। কি করতে হবে সে নকশাটা ও-ই তপনকে বুঝিয়ে দিয়েছিল।

নকশাটা কাজে লাগেনি, এই যা। চম্পকের সঙ্গে এক জেলেই ছিল তপন। কিন্তু চম্পক ওর সঙ্গে পূর্ব-পরিচয় অস্বীকার করে যায়। বুকে ঘা লেগেছিল তপনের। চম্পক বলেছিল, আমি যে তপনকে চিনতাম, সে তুমি নয়। ফোটো।

চম্পকরা একসঙ্গে থাকত, গান গাইত। ওয়ার্ডারকে মানত না। বন্দীদের খাবার নিয়ে, চিকিৎসা নিয়ে প্রতিবাদ করত। অন্য বন্দীরা চম্পকদের শ্রদ্ধা করত। সদুঃখে বলত, কি লাভ হলো নিজেদের জীবন নষ্ট করে?

তপনকে কেউ ওভাবে সস্নেহ কথা বলেনি কখনো। জেল থেকে বেরিয়ে চম্পক এই শহরেই প্রেস কর্মী ইউনিয়ন গড়েছিল। শহরেব প্রিয় ছেলে চম্পক। কিন্তু নকশাল ইউনিয়নের এই রমরমা ভবানীবাবু পছন্দ করেনি। চম্পক এর পর, অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে নিহত হয়।

তপন আজ বুঝল, ওটাও দীনুর কাজ। মলয় তেমন ইঙ্গিতই করল।

তপন-এর শহরে ঢুকে পড়ার ব্যাপারটায় দীনুও সন্দেহ শুরু করে। ভবানীবাবু তপনকে বলে, দীনুকে আমিই তুলেছিলাম।

—জানি!

—তোমাকেও আমিই লাইনে আনি। বর্ডার টাউন, বিজনেস বাড়ছে, মাসে দশ লাখ টাকায় উঠে যাবে রেভিনিউ।

—আমাকে কি বলছেন?

—ইরানীকে বলে লাভ নেই। ও দীনু ছাড়া কাউকে চেনে না।

—সেটা একটা প্লাস কোয়ালিটি ভবানীদা, ওর ওপর নির্ভর করা চলে। ও দীনুবাবুর সঙ্গে বেইমানি করবে না।

—ভুল করছ। ইরানী দীনু ছাড়া কাউকে মানবে না।

—মলয় হয়ত মানবে।

—মলয়, চিনা, বাদল······

—কিন্তু তাদের ওপর নির্ভর করা যাবে কি? যারা দীনুর সঙ্গে সহজে বেইমানি করতে পারে, তারা আমার সঙ্গে করবে না?

ভবানীবাবুর একটি চোখ নাকি কাচের। কোন চোখটি কাচের, তা বোঝা যায় না। দুটি চোখই ভাবলেশহীন, পাথর পাথর। ভবানীবাবু রাজা নয়, ও রাজা বানায়, গদিতে বসায়, রাজা ফেলে। টাউনটিতে পাটকল আছে, রেলইয়ার্ডে ওয়ার্কশপ আছে। বিশাল বিশাল বস্তি আছে।

ভবানীবাবুও টাউনের লোক। খুঁজলে দীনুবাবুর সঙ্গে কোনো আত্মীয়তাও পাওয়া যাবে। ভবানীবাবুর পূর্বপুরুষরা গঙ্গাতীরে টোল-চতুষ্পাঠী করে দিয়েছিলেন অনেক। ভবানী-বাবুদের বংশেই নাকি শেষ সতীদাহটি হয়েছিল। গঙ্গার ধারে সতীঘাট থেকে নদী সরে গেছে কবে। এখন সেখানে একটি ইটভাটা চলে।

ভবানীবাবুর বাবা রজনীবাবু ছিলেন গান্ধীভক্ত, প্রাচীন কংগ্রেসী। তাঁর ছেলেরা স্বাভাবিক নিয়মেই কংরেস শিবিরে থেকেছেন। প্রথম তিন ছেলে কলকাতায় সুপ্রতিষ্ঠিত আইনজীবী, তাঁরা আর টাউনে আসেন না। কারণ ভবানীবাবু।

ভবানীবাবু লেখাপড়াও করেনি, যৌবনেই সে কুলী বস্তিতে

মদের ঠেক খুলেছিল এবং চটকলের টাকা লুট করে সে ফেরারও হয়। রজনীবাবু তাকে ত্যাজ্যপুত্র করেছিলেন। কিন্তু বাবা মরতে না মরতে ভবানীবাবু টাউনে ফিরে এসে চটকলে কংরেস ইউনিয়ন করে। তারপর চুল্লু ও জুয়ার ঠেক গড়া, যুববাহিনী নামে মস্তান বাহিনী তৈরি করা, সব কাজেই সে এক পথপ্রদর্শক মানুষ। সে এতই ক্ষমতাবান হয় যে তার মদত ছাড়া বিধানসভায় নির্বাচিত হওয়া সম্ভব ছিল না।

এমন ভবানীবাবুরও বিয়ে হয়েছিল। কেন না এ দেশে খুনী হোক, লম্পট হোক, কালাকারবারী হোক, সব পুরুষেরই বিয়ে হয়। ভবানীবাবু স্ত্রীর দিকে মন দেবার সময় পেত না। স্ত্রী ছিল তেজী মেয়ে। দুজনের ঝগড়াঝাঁটি অনেকেই শুনেছে। এ সময়েই ব্যারাকবাড়ির বর্তমান মাসির সঙ্গে ভবানীবাবুর অন্তরঙ্গতা খুব বেড়ে যায়। এ ব্যাপারে ভবানীবাবুর স্ত্রীর খুব আপত্তি ছিল। এই স্ত্রী আগুনে পুড়ে হঠাৎ মারা যায়। লোকে সন্দেহ করে এ মৃত্যু নিছক দুর্ঘটনা নয়। কেন না সন্ধ্যায় তার স্ত্রী বারোয়ারী কালীপুজোর মণ্ডপে যায়। ভোরবেলা শোনা যায়, রাত এগারোটার সময় স্টোভে খাবার গরম করতে গিয়ে সে পুড়ে মারা গেছে।

সাত সকালেই দাহ হয়ে গিয়েছিল। পুলিশও আসেনি। ময়নাও হয়নি। মুখে মুখে কথা রটেছিল খুব। এখন সবাই বলে এত বউ পোড়ানো তো ছিল না, ভবানীবাবু পথ দেখালে। ভবানীবাবু এ সব কথা জানে কিনা কে জানে!

তারপর আর বিয়ে-শাদিও করল না। কয়েক মাস নাকি তীর্থদর্শন করে বেড়াল। ফিরে এল নতুন ভূমিকায়। এখন থেকে পলিটিস করব। বাড়িতেই আপিস হলো। নতুন যুবশক্তি দরকার বলে ভবানীবাবুই তার মস্তান বাহিনী তৈরি করে। সে তখন ট্রেড ইউনিয়নে পরামর্শদাতাও বটে। কারখানা ও মিলমালিক, সরকারী শ্রমদপ্তরের সঙ্গে ত্রিপাক্ষিক আলোচনায় বসে। ক্রমে ক্রমে টাউনের শক্তিমান কন্ট্রোলার হয়ে গেল। বস্।

ভবানীবাবু তপনকে বুঝিয়ে দিল, দীনু রাজনীতি বোঝে না। নিছক মস্তানি বোঝে। কিন্তু রাজ্যে এখন নয়া সরকার। এরা রাজনীতি বোঝে। পিপিল এদেরকে ভোট দে' ডেকে এনেচে।

এখন সম্মেলে চলা দরকার। দীর্ঘদিন আমরা এদেরকে দমন করে রেখেছি, বহুত মারদাঙ্গা করেছি, নানা কিছু হয়েছে। কিন্তু এখন আর সম্ভব না।

—এরাই আমাদের ছেড়ে দিয়েছে ভবানীদা।

—দেবে, দেবে, থাকতে এসেচে এরা।

—আপনারাও তো ছিলেন।

—ভুল করেছিলাম।

—এখন শোধরাবেন ?

—ধীরে ধীরে। অ্যান্টি-পিপিল কাজ আমিও করেছি। এখন অনুতাপ করি। দীনুর মতো একটা সমাজবিরোধীকে···

তপন বুঝে গিয়েছিল। একজনকে সমাজবিরোধী তৈরি করো, তাকে ব্যবহার করো, কাজ ফুরোলে ফেলে দাও তাকে। আরেক জনকে তোলো। এ খেলায় টিকে থাকতে হলে ভবানীবাবুর মতো রাজনীতিকদের সঙ্গে লড়ার মতো শক্তি থাকা চাই।

এখন আমাদের দরকার ওদেরকে।

অবস্থা এমন করতে হবে যে ওদের দরকারটা বেশি হবে। সেদিন আমরা একটা পোজিশান পাব।

এখনো সেদিন আসেনি, আসেনি সেদিন।

তপন বলল, দীনুবাবুকে একটা চান্স দেবেন না ?

ওর মনে হলো, দীনুবাবুর কাছ থেকে ভবানীবাবু অনেক সার্ভিস পেয়েছে।

—কি বলচ ? পাগল হলে ?

—টাকাপয়সা নিয়ে ও সরে যেতে পারে। নয় অন্যত্র যেত।

—দীনু যাবে না।

—তবু······

ভবানীবাবু হাতে চাপড় মেরে বলল, এখন নতুন সরকার। নতুনভাবে চলতে হবে। নাম থেকে কংরেসী ছাপ মুছে ফেলতে হবে। দীনুর মাথায় সে বুদ্ধি ঢুকবে ? দীনু কংরেসী গুন্ডা। তোমার মনে হচ্ছে ওকে একটা চান্স দেয়া উচিত ? ও সব নাটক-নবেলে। সেই যে কিছু বই পড়েছিলে, মাথাটা তোমার······

—বই আর পড়লাম কোথায় ?

—তোমাকে সমঝে চলতে হবে।

নইলে অন্য কোনো তপনকে আনবে ভবানীবাবু। সে তপনকে ফেলে দেবে। ভবানীবাবু ঝপ করে রাস্তা বদলাবে, বোঝাই যাচ্ছে।

—তুমি যে সতীপনা দেখাচ্ছ, তুমিও কি খুন করনি ?

—করেছি।

তপন কি ভুলতে পারে সেই অন্ধকারের পথে চলতে শুরু করার প্রথম পদক্ষেপ ? সত্তর সালে ওর বয়স মাত্রই কুড়ি। কিন্তু ক্লাশ টেন পাস করা থেকেই বাড়িতে লাথিঝাঁটা। বাবা ছিল বাস অফিসের বাবু, রোজ মদ খেয়ে বাড়ি ফিরত। মা ছিল হাসপাতালে আয়া। আর তিনটে ভাইবোনকে মা বড়ছেলের মতো পড়াবার বিলাসিতা করেনি। ছোট ভাই দুটো বাস গ্যারেজে ক্লীনারের কাজে অ্যাপ্রেন্টিস হয়েছিল। ছোটবোনকে মা এক ডাক্তারনীর বাড়ি ছেলে দেখার কাজে ঢুকিয়ে দেয়।

তপন মারদাঙ্গা করত, সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক করত। চাকরি যে কিছুতেই হবে না, তা ও জেনে গিয়েছিল।

চম্পক তো ভাল বাড়ির ছেলে. কলকাতায় পড়তে গেল। তপনকে ও বলত, এমন করে গোল্লায় যাচ্ছিস কেন ?

—আর কি করতাম ?

—অন্য কোনো কাজ ?

—আমি কি তুই ? আমাদের বাড়ি দেখেছিস ? লাথি-ঝাঁটার ভাত খাই বলেই তো লাইনে যাচ্ছি।

সাইকেল দাঁড় করিয়ে, আঙুল নাচিয়ে চম্পক ওকে বোঝাত, এ সমস্তই হয়েছে এই ফুটো স্বাধীনতার জন্যে। গরিব হচ্ছে মানুষ, খেটেও খেতে পাচ্ছে না। সমাজটা গলে পচে গেছে। তপনের মতো অপচিত ছেলেরা এ ব্যবস্থার শিকার।

—বুঝলাম। কিন্তু তোর মতো সরকারী চাকরে বাপ আর টীচার মা থাকলে আমিও তোর মতো ভাবতে শিখতাম। আমার কথা ছেড়ে দে।

—পড়বি ?

—পড়ে লাভ ? টাউনের কত জনা নৈহাটি এক্সচেঞ্জে নাম

লিখিয়ে বসে আছে জানিস ?

—তা বলে সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক করবি ?

—কেন করব না ? জামাপ্যান্ট, হাতখরচ, আমারটা আমি রোজগার করছি।

—সৎপথে রোজগার হয় না ?

—না, হয় না। অবিনাশ ডাক্তার বাজারে শুধু পুঁইডাঁটা কেনে। ওর হোমিওপ্যাথি বড়ি কেউ খায় না ! আর রবি ডাক্তার সাদা বড়িই দেয়, কিন্তু সঙ্গে "মায়ের আদেশে হোমোপাথি করছি" ফিট করে রেখেছে, রোজ পাঁঠার মাথা খায়। দুজনে সহোদর ভাই। টাউনে চল্ না, দেখিয়ে দেব।

—প্রাথমিক স্কুলের কাজও হয় না ?

—বাবা টাউনে মালখোর গোপাল নামে ফেমাস, মা হাসপাতালে ঝি, তাদের ছেলেকে মাস্টারি দেবে কে ? আর, ক' পয়সাই বা মাইনে ?

—কি বলব বল্ ?

—বলিস না।

—সৌরভ তো পড়ছে।

তপন অসীম ঘৃণায় বলেছিল, পড়ে কি হয় ? সৌরভ যে বিড়ি বেঁধে, টিউশনি করে পড়ছে, পড়ে কি করবে ? বি এ, এম এ কত জন বেকার তা জানিস ? হিট পিকচার লাগলে আমি একদিনে বিশ টাকাও কামাই। সৌরভ পারবে ?

—তোর সঙ্গে কথা বলা……

—বৃথা। বলিস না চম্পক। আমার সঙ্গে কথা বলছিস দেখলে লোকে ঘেন্না করবে।

—আর যা করিস, গুণ্ডামি করিস না।

—গুণ্ডারা ভালই থাকে চম্পক, দীনু গাঙ্গুলীকে দেখ্। কি গাড়ি, পকেটে নোটের তাড়া !

—যাঃ, তুই ও পথে যেতে পারিস না।

পথে কে যায় ? পথই ডেকে নেয়। বিশ বছরের মধ্যেই তপনের যেন সব ধৈর্য ফুরিয়ে গিয়েছিল। রাগে গনগনে হয়ে থাকত ও। এ টাউনে ওর মন হাঁপিয়ে উঠেছিল। বাড়ি যেতে ঘেন্না করত।

বাবা প্রত্যহ বলত, পতে দেগলে চিনতে চায় না। ঘেন্না করে। ঘেন্না যকন, তকন হেতা পড়ে আচে কেন? নিজেরটা নিজে করে খাগ্‌গে।

মা বলত, ঘেন্নাপিত্তি থাগলে যেত।

শুধু চম্পকই তার ওপর নজর রাখত না, ভবানীবাবুও রাখত। এ সময়েই পুজোর সময়ে তপনদের পাড়ার সঙ্গে লায়ালকা জুট মিলের বিখ্যাত পুজো-পার্টির ছেলেদের খণ্ডযুদ্ধ হয়ে যায়। লায়ালকা জুট মিলের পুজো-মণ্ডপে কোন মহিলাকে অপমান করার ব্যাপারে বেশ কিছু ছেলে জীপ চালিয়ে প্রতিশোধ নিতে আসে। অফিসারদের লালটু ছেলেরা হকি-স্টীক নিয়ে এসেছিল। তপন একাই তাদের বেদম ঠ্যাঙায় বাঁশ দিয়ে। ব্যাপারটির জের লেগে থাকে। কেন না কালীপুজোর দিন যারা বোমা ছুঁড়তে আসে, তারা ভাড়া করা। মিলনমেলার ছেলেদের ঠ্যাঙানো ও শাসানোর পক্ষে মোর দ্যান এনাফ বলেই তাদের বলা হয়েছিল।

তপনরাও কম তৈরি ছিল না। তপনের নেতৃত্বে যে যুদ্ধ হয়, তাতে জগনের হাত উড়ে যায়, জীপ জ্বলে যায়, ড্রাইভার মরে যায়, পুলিশ আসে।

ড্রাইভার মরতে তপনকে মার্ডারার করে দেয় পুলিশ, কিন্তু তপনকে মহাবিস্মিত করে ভবানীবাবু থানাগারদে চলে আসে, ওকে খালাস করে নিয়ে যায়। অফিসারকে বলে, অবাঙালী বনাম বাঙালী এ লড়ায়ে বাঙালী ছেলেরা দুষ্টের দমন করেছে। এমন ছেলেকে আপনি ধরে রেখেছেন? খুনের চার্জ। কে দেখেছে ওকে খুন করতে? তপনকে বলে, বা ভাই, বা!

বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বড় বড় মিষ্টি খাওয়ায়। বলে, মায়ের প্রতিমা ড্যামেজ হয়েচে। এবার মিলনমেলার প্রাশ্চিত্তি পুজোটা আমিই করে দেব।

পুজো বাবদে দুহাজার টাকা, তপনকে "রাখো না, রাখো তো" বলে পাঁচশো টাকা পকেটে গুঁজে দিয়ে তাকে কিনেই ফেলে। পাঁচশো টাকার নোটে রক্তে কি উন্মাদনা, প্রাণে কি উৎসাহ!

তবু তপন বলেছিল, টাকা দেবেন না।

—কেন, কি হলো?

—আমাকে একটা কাজ দিন।

—কাজ তো দেবই। ধরো কাজ তোমার হয়ে গেচে। কাল থেকেই এসো।

—কি কাজ, দাদা ?

—এখন চারদিকে শত্তুর, শত্তুর, বুঝেছ ? আমার সঙ্গে থাকবে, আমার ডান হাত হয়ে থাকবে। মাসে পাঁচশো বল, সাতশো বল, টাকা পাবে। তবে বাড়ি ভুলে যেতে হবে। আমার এখানেই থাকবে, খাবে, বুঝেচ ?

পাঁচশো টাকার গরমে তপন খুব গরম হয়ে যায়। টাকা তা পারে। তপন স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। জীবনটা সিনেমার মতো হয়ে যাচ্ছে। আজ পাঁচশো। কাল পাঁচ হাজার, সব হয়ে যাবে। ভবানীবাবুকে মহাপুরুষ মনে হয়েছিল। বাড়ি ফিরছিল দশ টাকার মিষ্টি আর পনের টাকার মাছ নিয়ে। অবাক করে দিতে হবে বাড়ির লোকদের।

মা তো হতবাক। মাকে বলে, রেবাকে ছাড়িয়ে আনো। সুকু-বুকুকেও।

—তুই কি পাগল হয়েছিস ?

—টাকা নাও, মাসে মাসে পাবে। রেবা বাড়িতেই থাকুক। বড় হয়ে গেছে।

—চাকরি পেয়েছিস ?

—কাজ ! কাজ করব, টাকা পাব, তোমাকে দেব। তুমি তো ভাবতে আমি জাহান্নামে গেছি।

—সবই তো জানিস। অকথাকুকথা বলেছি, সে তো নানা জ্বালায়।

—আর ভাবতে হবে না। মাছটা কেমন মা, ভাল ?

—এমন মাছ ! ভাল হবে না ?

কাজ করব, রোজ মাছ খাব।

সেদিন তপনের সুখের স্বপ্ন খুব সাদামাটা ছিল। রোজ মাছ খাবে সবাই, সুকু বুকু কোনো কাজ শিখবে, রেবা স্কুলে যাবে। এ হলেই অনেক হল।

বাবা বেরিয়ে এসেছিল।

—বাপকেও দিয়ে যা কিছু।

মা বালছিল, মদ গিলবে বলে ?

চুপ কর মাগী।

তপনের মনে তখনো অন্য উন্মাদনা। তপন ক্রুদ্ধ আক্রোশে বলেছিল, সেদিন পুজো-প্যাণ্ডোলে তিনটে মাথা ফাটিয়েছি, চারটেও ফাটাতে পারব। একদম অসভ্যতা করবে না। সাবধানে থাকো।

—তুই বাপকে মারবি ?

—তেমন বাপ হলে মার খেতে হবে।

বাবা চেঁচিয়েছিল খুব। কিন্তু ভবানীবাবুর গাড়িতে তপন যাচ্ছে এ খবর জানার পর বাবাও চুপসে যায়।

তিন মাসেই তপন ভবানীবাবুর কথায় স্টেশন বাজারের স্টল থেকে পুরনো হকার উচ্ছেদ করে মোটা টাকার বিনিময়ে নতুন হকার বসায়। আর হকার ইউনিয়নের সেক্রেটারীকে মেরেধরে হাসপাতালে পাঠায়।

এ সব কাজ সকলের সামনে করা গিয়েছিল। কিন্তু রেলের ও হাসপাতালের হরিজন বস্তিতে চুল্লুর ঠেক বসানো নিয়ে যখন ভরত বাশফোর "চলবে না, চলবে না" আন্দোলন জোড়ে, ভবানীবাবু বলেছিল, ব্যাপারটা বাজে হয়ে যাচ্ছে। ইউনিয়ন আমাদের। রেলে লোক আমরা ঢোকাই। তা নিয়ে ওরা হাল্লা কম করচে না। আমাদের কোটায় তোমাদের লোক ঢোকাচ্ছে, তারা সাফাই কাজ করে না, আমরাই করি। তারা শুধু মাইনে নেয়।

তপন ঈষৎ হেসেছিল, আমারাও একালে ওদের মদত দিয়েছি।

কিন্তু ব্যাপারটা বোঝ। চাকরি আমাদের ছেলেরা পাবে না। মদ চুল্লু তো ওরাও খায়। মদ চুল্লুর ব্যাপারে ভরতের এত আপত্তি কেন ? আর মদের ব্যবসা করে দিয়ে কিছু ছেলেকে স্বনির্ভর করে দেওয়া গেল, যাক না।

এরা ওদের মেয়েদের ইজ্জতও নিচ্ছে।

বাজে কথা, বাজে কথা তপন। ভরত বাশফোর খুব নেতা হয়েচে। ওরা ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীও তৈরি করেচে।

—কি করতে বলছেন ?

—ওকে ফেলে দাও।

—ভরতকে ! ওদের মাঠে আমি বল খেলেছি ।

—তাতে কি ?

—হঠাৎ······ওকে······

—ভরত একটা আপদ ।

—ওর মাথা গরম । চেঁচায় বেশি, সাহসী ছেলে, দরকারে হাত ওঠে ওর । এ তো আমি জানি । কবে থেকে চিনি ওকে ।

—ভরত মারদাঙ্গা করে তা জান ?

কিন্তু খুন করে না, তপনের মন বলছিল । তবু ভরতকে তপনই মারে, আর ব্যাপারটা পাকেচক্রে ঘটে যায় । ভগবান জানেন, তপন ওকে মারতে চেয়ে সেদিন বিকেলে ভরতের বোনকে সাবধান করতে যায়নি ।

ভরতের বোন চামেলির বয়স বছর বাইশ, দু সন্তানের মা, হাসপাতালে জমাদারনী । ভরত বোনের বাড়িতেই থাকে, রিকশা চালায়, এক্সচেঞ্জের সঙ্গে লাইন আছে, এবার কাজ পেলেও পেয়ে যেতে পারে ! ক্লাস এইট অবধি পড়েছিল, হাতের কাজ শেখার ইচ্ছে ছিল । কাজ না পেয়ে পেয়ে, তথাকথিত সংরক্ষণের সুযোগ না পেয়ে পেয়ে, ভরতের মাথায় রাগ জমতে শুরু করে, সর্বত্র ও অবিচার দেখতে পেত । চামেলিকে বলত, ছক্কাপাঞ্জা উলটে গেছে, এখন সব তিন তাসের খেলা । এটা ধরম হয় না, ওটা ধরম হয় না, বলবি না । কে আমার সঙ্গে ধরম করছে যে আমি ধরম মেনে চলব !

—তুই শাদি করে নে ।

খাটা পায়খানা, বস্তি, নেশা-ভাং, ভালভাবে কোনো বাঁচার পথ নেই । এর মধ্যে বউ বাচ্চা ?

ভরত হরিজন, হরিজন হয়েই বাঁচতে চাইত । কিন্তু সভ্য ভদ্র মানুষের মতো । বস্তির মধ্যে পচে পচে মরতে রাজী ছিল না । সংরক্ষিত কোটা কোথায় গেল, "নৈহাটি এক্‌সচেঞ্জ জবাব দাও" বলে এক্‌সচেঞ্জ ঘিরে অনেক চেঁচিয়েছে । ও তো হরিজনদের ঐক্যবদ্ধ করতে চাইছিল ।

তপনকে ও দেখেও দেখত না, চিনেও চিনত না । তপন তাই চামেলির বাড়ি গিয়েছিল । বলেছিল, ভরতকে বলে দিস চামেলি,

বস্ খুব নজর রাখছে। একা যেন রাতবিরেতে না ফেরে। আমার সঙ্গে তো কথা বলবে না।

- মনে দুখের পর দুখ উঠে গেল। তাতেই জ্বলে থাকে সব সময়ে। একটা চাকরিও তো পেল না।

—রেলের ইউনিয়ন এ সব কথা তোলে না কেন ?

· ভবানীবাবুর ইউনিয়ন !

—হ্যাঁ······তাও তো বটে। আমি দেখব জগদ্দলে একটা জুতোর দোকানে কাজ হয় যদি !

—দেখ !

—তুমি বোল কিন্তু। আমি ভাল মনে বলে গেলাম কথাটা। ও যদি কোথাও সরে যেত···

চামেলি নিশ্চয় ঠিকভাবেই কথাটা ভাইকে বলে। ওদের বাবা ধানু বাশফোর আম্বেদকর মিশনে ছিল। ও একটু অন্যরকম মানুষ ছিল। ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাত। নিজে নেশা-ভাং করত না। বিয়ে-শাদিতে মদের খরচ তুলে দাও বলে আন্দোলন করেছিল একসময়ে।

চমৎকার ঘুড়ি বানাতে পারত। ধানুর তৈরি ঘুড়ি নিয়ে বিশ্বকর্মা পুজোর দিন তপনরা ওড়াত।

তপন ভেবে পাচ্ছিল না, ভরত ভবানীবাবুর কাছে কতটা বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল। এটা সত্যি যে টাউনে হরিজন বস্তিগুলো রেলের জমির ওপর হলেও, রেল কোম্পানি বা পৌরসভা উন্নয়নের কোনো কাজ করেনি ! খাটা পায়খানা, সংলগ্ন বস্তি, শুয়োরের খোঁয়াড়। এটাও সত্যি যে হরিজন বস্তির মধ্যে মধ্যে মস্তানরা চুল্লুর কারবার খুলেছে।

চুল্লু, হল্লা, মেয়েদের নিয়ে টানাটানি। ভরতরা বারবার থানায় গেছে নালিশ নিয়ে, নির্বাচিত সদস্যদের কাছে, কিন্তু তাতে কোনো কাজ হয়নি।

চম্পক কি ভরতদের মদত দিচ্ছে ? তপন তো চামেলিকে বলল, ভরতকে সামলে চলতে।

এটা জানলে ভবানীবাবু তপনকে সন্দেহ করবে। কিন্তু এখন সে দীনুবাবুকে সরাতে চায়, তপনের হাতে তুলে দিতে চায় টাউন।

ভবানীবাবুই কন্ট্রোলে থাকবে।

এখনি ভবানীবাবু তপনকে সরাবে না। সুযোগ দেবে একটা। তপন যেদিন দীনুবাবুর মতো সুপারঅ্যানুয়েটেড হয়ে যাবে, সেদিন তপনকে সরে যেতে হবে। সরে যাওয়া মানে মুছে যাওয়া। সরে গিয়ে কে বাঁচতে পেরেছে? তপনকে কাজটা করতেই হবে। ভরত! আমি তোকে সুযোগ দিচ্ছি একটা। তারপর দরকার হলে···তুই যদি বুঝে চলিস। আমার রক্ত যখন নেচে ওঠে, আমার ছুরিটাও তখন যেন নেচে ওঠে। আমার হাত ছুরি ধরে না। ছুরিটাই উঠে আসে হাতে। আমাকে কন্ট্রোল করে।

ভবানীবাবু আমার আর দীনুবাবুর কন্ট্রোলার। একদিন আমাকে সামনে রেখে ভবানীবাবু টাউনের কন্ট্রোলার হবে।

এখন এ শহরের ইতিহাস এ রকমই হবে। একসময়ে এ শহরে বড় বড় লেবার ইউনিয়ন ছিল। অনেক বিক্ষোভ, অনেক মিছিল হয়েছে। তখন জীবনে একটা স্রোত ছিল। লেবার নেতারা 'কমরেড' বলত সকলকে। সে সময়ে থানার সঙ্গে জবরদোস্তালি থাকলে সে লোক ভয়ে মুখ লুকিয়ে বেড়াত।

এখন থানা আমাদের মামাবাড়ি। পুলিশের সঙ্গে লাইন থাকা এখন আর নিন্দনীয় নয়। গর্বের ব্যাপার। কিছু ঘটে গেলে মানুষ পাগল হয়ে দৌড়য়, কার সঙ্গে পুলিশের লাইন আছে, তাকে ধর। ব্যাপার হলো যে যে লাইনেই দৌড়ও, পৌঁছবে ভবানীবাবুর কাছে।

বিকেল-সন্ধ্যার মুখে তপন যখন স্টেশন থেকে চা খেয়ে ফিরছে, সিনেমার টিকিট ব্ল্যাকার সবুজ ওর কাছে এসে দাঁড়াল। সবুজ টিকিট ব্ল্যাকার, ওর যমজ ভাই শ্যামল এখনো চম্পকের প্রেসকর্মী ইউনিয়ন করে। এ শহরে বস্ ভবানীবাবু, দীনুবাবু দাদা, কিন্তু হাজার হলেও চম্পকের শহর। একটা উলটো স্রোতের অভিঘাত আছেই। ওদের সংস্কৃতিমঞ্চ আছে, গণসংগীতের দল আছে, ওরা চম্পকের মৃত্যুদিবসও পালন করে। শ্যামলরা হরিজন বস্তির মাঠে গান-নাটক করছে বটে। আর ভরত বাশফোরের ঘটনা তো ঘটে অনেক পরে।

সবুজ বলল, দাঁড়াও তপনদা।

তপন সাইকেল থেকে নামল। সবুজ কি জানে, তপন বেশিদিন সাইকেলে ঘুরবে না, মোটর সাইকেলে ঘুরবে, রোজ মাছ-মাংস খাবে, টাউনের সুন্দরী মেয়েদের নিয়ে সিনেমা যাবে? সম্ভবত জানে।

—কি, সবুজ?

সবুজ চারদিকে চোখ রাখতে রাখতে বলল, ভরতদা ডেকেছে। বলেছে চার্চের মাঠে দেখা করতে।

—কখন?

—শো ভাঙলে। আজ "উস্তাদ" দেখছে।

—এই শো-তে?

—হ্যাঁ। ইভিনিঙেই দেখে। তারপর নাইট ইস্কুল বন্ধ করে।

—শ্যামল কি করছে?

—আছে।

তপন ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরছিল। এখন ওর ভাল পোজিশান বাড়িতে। টাকা দিয়েছে, আবার দেবে। মা ওকে গরম রুটি আর চা দিয়ে বলেছিল, ভবানীবাবু তোকে ডেকেছে।

ভবানীবাবু বলল, চামেলির বাড়ি গিয়েছিলে কেন?

—ভরতের খোঁজে।

—আমার খবর, ভরত অত্যন্ত হারামি হয়ে গেছে। ও চম্পকদের সঙ্গে মিশত।

—ভরত? বিশ্বাস হয় না।

—আমার কথা বিশ্বাস হয় না?

—কে আপনাকে এ সব খবর দিচ্ছে?

—আমাকে খবর রাখতে হয় তপন। তোমার খবরও রাখতে হয়।

—আমার আবার কি খবর?

—দেখা করতে যাচ্চ?

—কে বলল?

—তোমাকে যে বলল। টাউনে আমার অনেক লোক তপন। ধীরে ধীরে জানতে পারবে। ভরতের সঙ্গে দেখা করবে। এই তো সুযোগ। এ সুযোগ কাজে লাগাও।

তপন চমকে গিয়েছিল।

—তুমি কাজ সারবে, পরের হ্যাপা আমার।

—কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায়……

—হাত কাজ করবে, মাথার কি?

—যদি ওকে বুঝিয়ে পারি, তবে? খুনের কথাই বা ভাবব কেন? হাতে থাকলে ও কাজে দেবে।

আসলে তপনের মনে হচ্ছিল, ভরত যদি একটু বোঝে, তাহলে কাজ হবে। ছোটবেলা ঘুড়ি ওড়াবার স্মৃতি, নিজের শৈশবকে হত্যা করবে তপন? কেমন করে?

—সে তো ভাল, খুবই ভাল। ভয় পাচ্চ?

—না ভয় পাইনি।

ভরতও বোধহয় খুন হবার জন্য খুব ব্যস্ত হয়েছিল। চার্চের মাঠ এখন নানা কাজে ব্যবহৃত। বড় বড় গাছ, রাস্তা তৈরির রোলার কতগুলো। ভরত দাঁড়িয়েছিল গাছে হেলান দিয়ে।

—ভরত!

—শালা কংসাল! আমার বোনের কাছে গেছলি কেন?

—তোকে সাবধান করতে।

—কেন, মারবি?

—মারতে চাই না। তুই ফুটে যা।

ভরত বুনো শুয়োরের মতো ঘোঁত ঘোঁত করেছিল।

—আমি ফুটব কেন? আমি টাউনের ছেলে। টাউনে কোনো মারদাঙ্গা করিনি কারো টাকা খেয়ে। তোরা, অ্যান্টিসোসালরা, ফুটে যা। টাউন সাফ হয়ে যাবে।

—আমি টাকা দিচ্ছি ভরত। তুই কিছুদিন সরে যা।

—আমি হারামির কথা শুনি না।

—আমরা একসঙ্গে খেলেছি…

—তোরা হরিজনদের জীবনে চুল্লু ঢোকাবি, মেয়েদের ইজ্জত নিবি, তোরা ফুটে যা।

—তুমি কথা শুনতেও রাজী নও?

—না, শুনলে তোদের কথা শুনব কেন? চুল্লু যেমন চলছে চলবে, তাই ভেবেছ?

—আমাকে ডাকছিলি কেন?

—শিক্ষা দেব বলে।

—কেমন শিক্ষা ?

যেমন মেথর ইউনিয়নের রবি দাসকে তোর বাবা দিয়েছিল। ভবানীবাবু। তোর তো অনেক বাবা এখন। গোপালবাবু, ভবানীবাবু, দীনুবাবু, থানা-বাবু……আমার শালা বাবা নেই, আমি অনাথ।

ভরত!

—যা, বাবার কাছে যা।

—না, তুই আমার কথা শুনে যাবি।

তপন ভরতের জামার কলার ধরে টেনেছিল। ভরতও দীর্ঘদিন জ্বলে আছে। তার ভেতরেও চাপা রাগ জমছিল আর জমছিল।

-গায়ে হাত দিলি শালা……

তপন ওকে ঠেলে দেয়। কিন্তু ভরতের পকেটে ভারি টর্চলাইট ছিল। ভরত ওকে কপালে মারে। আজ দুজনের একজনকে মরতে হবে। তুই মরবি তপন। নইলে টাউনে অনেক মারবি।

ফিনকি দিয়ে রক্ত। ভরত, ভরত, তপন রক্ত দেখলে, নিজের রক্ত দেখলে পাগল হয়ে যায়। তবু তপন গোড়ালিতে বাঁধা চাকু বের করছিল না। কিছুক্ষণ ওরা পশুর মতোই যুদ্ধ করে। নিঃশব্দে। ভরত ওকে ঠেলতে থাকে, ঠেলতে থাকে।

—আমি জানি না, ভবানীবাবু তোকে কেন পাঠিয়েছে ?

ভরতের হাত চেপে বসছে গলায়। গলার পেশী ফুলিয়ে তপন কতক্ষণ ওকে আটকাবে। সর্বশক্তি দিয়ে হাঁটুর গুঁতোয় ও ভরতকে ছিটকে ফেলে। তারপর গোড়ালি থেকে স্ট্র্যাপে বাঁধা চাকুটা বের করে নেয়।

গাছের ফাঁকে সামান্য আলো। তপন ছুরি ধরে এগিয়ে যায়। দুজনে আর ফেরা যাবে না। দুজন ঢুকেছিল, একজন বেরোবে।

ছুরি এখনো, চালাতে জানলে নিঃশব্দ ঘাতক। ভরত পড়ে যায়। তপন শুকনো ঘাসে ছুরি মুছে নিয়ে বন্ধ করে, আবার বাঁধে গোড়ালিতে। নিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ায়। না, খুব পাবলিক নয় জায়গাটা। সকালে কে আসবে মাঠে, কে জানে! তপন এগিয়ে এসে সাইকেলে ওঠে। ভবানীবাবুর বাড়ি।

ভবানীবাবু নেই। টাইগার আছে। ছিল তারকনাথ, হয়ে গেছে টাইগার।

—ভবানীদা কোথায় ?

—কলকাতা। চলো।

—কোথায় ?

—কলকাতায়। আমি গাড়ি রেখেছি।

গাড়িতে বসে বমি করে ফেলে তপন। ভরত, ভরতকে ও খুন করল ? ভরত ওকে এত ঘৃণা করত ? ভরত নেই, ভরত নেই। তপন নিজের শৈশবকে খুন করেছে। এরপর কে বিশ্বাস করবে তপনকে ?

তারপর কলকাতা। মাসখানেক বসে যাক টাইগারের বোনের বাড়ি গাড়িয়াতে। ভগ্নীপতি মোটর গ্যারেজে আধা অংশীদার। বাড়িতে বোন, তার শাশুড়ী, বোনের মেয়ে। ভবানীবাবুর কিছু গাড়ি নাকি এখানেও ভাড়া খাটে।

টাইগার বলল, সেফ জায়গা। পড়ে থাকো, গ্যারেজে বস। সময় হলে দাদা ডেকে নেবে।

তপন এক মাস খেয়ে বসে থাকল। চাপদাড়ি গজিয়ে উঠল, চুল বড় বড়। টাইগারের ভগ্নীপতি বলল, হিন্দী ছবির নায়ক হয়ে গেলে তুমি।

তাই। তেমনি অবাস্তব জীবন। তবে সিনেমায় চাকু চালালে মানুষ খুন হয় না। শুটিংয়ের পর নায়ক ভুলে যেতে পারে। তপন কেমন করে ভরতকে ভুলবে ?

একটি মাস প্রতি রাতে ভরত ওর স্বপ্নে আসত ঘুড়ি নিয়ে। ওরা মাঠে দৌড়ে দৌড়ে ঘুড়ি ওড়াত।

—আমি তোকে মারতে চাইনি ভরত।

—তবে মারলি কেন ?

—তুই যে শুনলি না।

—চাকু নিয়ে এসেছিলি কেন ?

—বের করতে চাই নি।

—চাস নি ?

—না…না…বলে চেঁচিয়ে তপন জেগে উঠত। বোনের বর

বলত, পাশ ফিরে শোও দাদা, জল খান।

টাইগার খবর দিয়ে যেত।

সকালে বস্তির লোকজনই ভরতকে আবিষ্কার করে। তারপর হরিজন স্কুলের ছোট ধানুবাবু, শিববাবু থানায় দৌড়য়। চামেলি বলেছিল, তপন ওর খোঁজ করেছিল। কিন্তু তপনের বাড়ির লোকরা বলেছে, তপন সন্ধ্যাবেলাই চলে গেছে।

—কোথায় গেছে ?

—শিলিগুড়ি। বিজনেস করছে। ফিরবেও শিলিগুড়ি থেকে। টাউনের অবস্থা কি ?

শ্যামলরা তো খুব অ্যাকটিভ। নিজেরা মিছিল বের করল। কলকাতা থেকেও কিছু লোক গেল। টাউন থেকে সমাজবিরোধী উচ্ছেদ করতে হবে, করতে হবে, বলে থানার সামনে খুব হইচই করল, মেমো দিল ও সিকে।

—মেমো রেন্ডাম !

—ওই হলো।

—হলো কিছু ?

—কি হবে ? এখন পার্টি এসে গেছে। আমরা লিখে দিয়েছি, ভরতের চুল্লুর কারবার ছিল। লাভ-লোকসানের ঝগড়া থেকেই খুন হয়েছে।

—ভবানীদা কি বলছে ?

—চুপ করে থাকতে বলছে।

—চুল্লুর ঠেক তো তোমারও !

—আমি, বম্বা, থাকু, রঙিন, সেন পারসেন লাভ।

—আর ?

—তোমাকে খাম দিয়েছে।

টাইগার খামটি দেয়। খামে পাঁচ হাজার টাকা। ভরতের জীবনের দাম খুব বেশি নয়। তপন যে ঝুঁকি নিল, তার দামও খুব কম। চুল্লু থেকে ভবানীবাবু কত পায় ?

—তোমার ভবানীদাকে কত দাও ?

—আচে, শেয়ার আচে। দিয়ে থুয়ে খাই। তোমার দিনও আসবে। দিয়ে থুয়ে খেতে হবে। দীনুবাবু এটা বুঝচে না।

সে নিজে খাবে বারো আনা।

—তোমার বোন ভগ্নীপতি সব জানে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব।

—তোমার মা-বাবা নেই?

মালদা বডারে আচে।

তারা সব জানে?

—জানবে না কেন? ছেলেদের লেখাপড়া শেখায়নি, তবু তারা কামাচ্চে কোথা থেকে, বুঝতে পারে না? তবে লাইন হিসেবে নো ইনভেসমেন্ট, অল প্রফিট কিসে বল ত?

—কিসে?

—মেয়ে-কারবারে। কাঁচামাল ছড়াছড়ি। দেখে তোলো, চালিয়ে দাও।

টাইগার একটু উসখুস করল।

—কিছু বলবে?

—কি বলব? শ্যামলের কথা জান?

—কি জানব?

—তোমার বোনের সঙ্গে খুব······

—কে বলল?

সবাই জানে।

—যাক গে, আমি কোনো খবরও রাখিনি, দায়িত্বও নিইনি, বিয়ে যদি করে······

ভবানীবাবু চায় না।

—দেখব, দেখব।

রেবা তো তপনেরই বোন। এখন তপনের মনে পড়ল, মা হাসপাতালে আয়া ছিল। হাসপাতালে ডাক্তারনীর কোয়ার্টারে রেবা ভাত-কাপড়ে কাজ করত। ভাল খেয়ে-পরে ওর চেহারা ফিরেছিল। কাছাকাছি থাকত শ্যামলরা। হাসপাতালের ড্রেসারের ছেলে শ্যামল আর সবুজ। শ্যামল কেমন করে রাজনীতিতে গেল, আর সবুজ কেমন করে টিকিট ব্ল্যাকার হলো, তা তপন জানে না। রেবা আর শ্যামল? প্রেম? তপন জানে না। রেবা বা ছোট দুভাই সুকু ও বুকুর সঙ্গে ওর কথাবার্তাই নেই বলতে গেলে।

শ্যামলের বাবা মরেও যায় ক'বছর আগে।

তপনের ভাইরা যে যার পথ দেখে নিয়েছে।

সুকু সুদক্ষ ইলেকট্রিক মিস্ত্রি, রেডিও সারায়।

বুকু বনগাঁয় জয়বাংলা-জামাকাপড় বেচে।

বাড়ির সংস্পর্শ দুজনেই ছেড়ে গেছে। ভালই করেছে। তপনের দিন ফিরলেও তপন চাইবে না যে ভাইরা তার সঙ্গে থাকুক।

এক মাস ধরে তপন যেখানে থাকল, তাদেরও জানার চেষ্টা করেনি। রান্না হয়ে গেলে টাইগারের বোন ভাতের থালা দিয়ে যেত। ভাইকে ও বলত, "তারক"। টাইগার নামটা কি ও জানে না?

সন্ধ্যাবেলা ছেলেকে পড়াতে বসত। ভাল স্কুলে পড়াতে হলে এখন নাকি মা-বাপকে খাটতে হয়। এ সব তপনের কাছে অজানা জগৎ। টাইগারের বোন ও ভগ্নীপতির মধ্যে কখনো ঝগড়া হতো না। এমন দাম্পত্য-সম্পর্কও তপনের অজানা। শাশুড়ীর সঙ্গেও ওর সম্পর্ক ভাল। টাইগারের বোন সকলকে খুশি রাখার জন্যে খুব বেশি সচেষ্ট।

টাইগার বলল, দু দু বার বাড়ি থেকে ভেগে যায়। শেষে একে ধরে ঝুলে পড়ে, দেখচই তো বীরেন কত ভাল মানুষ! ওকে গ্যারেজ করে দিয়ে বিয়ে দিলাম। সবই ভবানীদার কৃপায়।

---এ বাড়িটা ওদের নিজেদের?

—নিজেদের নয়, আবার নিজেদেরও। যার বাড়ি সে এ জীবনে ওদের তুলতে পারবে না। হেঁপো রুগী, ছেলে থাকে আমেরিকা, তায় বুড়ির নেই বুদ্ধি, কেস করেছে। কোর্টে মামলা গেছে, সিবিল সুট, এ বাড়ি এরাই নেবে।

টাইগারকে এতদিন তপন তেমন আমল দেয়নি। ছেলেটার চোখের চাহনি ঠাণ্ডা, স্থির স্থির। চলাফেরা নিঃশব্দ। বয়স ছাব্বিশ হবে। নেপাল বর্ডার থেকে এসেছে। এ বয়সের মধ্যেই কয়েকটি খুন করেছে। তপন জানে, ধানবাদে একটা খুন করে ও শেলটার নিয়েছে ভবানীবাবুর কাছে। এমন ছেলে সম্পর্কে সাবধান থাকতে হয়, কিন্তু মানুষ হিসেবে ওর সম্পর্কে ভাবার কিছু নেই।

কিন্তু এই টাইগারই ওর বোন, বা বোনপো সম্পর্কে মনোযোগী।

কি আশ্চর্য !

- বাবা কি বাড়ি করেছেন ?

ভাল এক্সচেঞ্জ পর্পার্টি দাদা। গ্রাম, তবে সেমিপাউন। সেখানে দুবিঘা জমি, আমবাগান, একতলা বিলডিং। বাবা করেছিল।

-ভাল তো ?

বাবা শাহেন শা লোক। গ্রামের বাড়ির সঙ্গে মুসলিমদের গ্রামের বাড়ি বদলে নিল। তারাও আসে, বাবাও যায়। খুব ফেন্‌লি রিলেশান। ওরা বাড়ি দেখতে আসে, বাবা বাড়ি দেখতে যায়।

—আর ভাইবোন ?

ভাই দুটো লাইনে আছ। একটা বোন, একটা মাস্টারের সঙ্গে প্রেম করছে। বে' দিয়ে দেব। ওই বোনটাই সব পাবে। ভাইরা কে আর ফিরবে বল ? আমার তো ইচ্ছে ম্যারেজ করে এই টাউনেই সেটেল করি। টাউন আর গ্রামে অনেক তফাত।

—সে তো ভাল কথা।

—সে সব হবে না। লাইনে চলে এলে আর সেটেলমেন্ট হয় না।

—দীনুবাবুর তো হয়েছে।

- সে আর কতদিন টিকবে ? আগেকার লোকরা লাইনও করেছে হোমলাইফও রেখেছে। আমাদের টাইম তেমন নয়। ভরতই দেখ না, আর নয় চার-পাঁচ বছর যেত। সেটেল করে যেত।

—ভরত লাইনের ছেলে ছিল না।

--তুমি জানবে।

সময়টা অগ্নিগর্ভ হয়ে যায়। দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে থাকে। তারপর টাইগার বলে, কাল আমরা ফিরছি। ভবানীদা টাউনে এসে গেছে। আমরা মিটিং করব স্টেশনের মাঠে। নতুন এম. এল.এ থাকবে। টাউনে শান্তি রক্ষে, পুলিশের নিষ্ক্রিয়তাকে ধিক্কার, সব থাকবে।

সব থাকল। ভবানীবাবুও থাকল। তপন টাউনে বেরিয়েই বুঝল, সবাই সব জানে। ওর দিকে চাইতে সবুজও ভয় পাচ্ছে। ভবানীবাবু বলল, জান তো ভরতের ব্যাপারটা দীনুর দিকে চলে গেছে।

—কি করে ?

— মলয়ের সঙ্গে ভরতের ফাইট হয়েছিল।

—যাক গে। টাকা আপনি খুব কম দিয়েছেন।

—টাকা টাকা কর না তপন। তোমার দিন আসছে। দীনুর কাজকর্ম নিয়ে অনেক কথা উঠে গেছে। ব্যারাকবাড়িটা এখন কিছুকাল বন্ধ রাখা দরকার। আমাদের ইমেজটা পষ্কের করা দরকার। এমেলে সুধীনবাবু খেঁকুরে লোক। এখন ক্ষ্যামতায় এসেছে, ইউনিয়নে ছিল।

তপনের মনে হয়, সুধীন সেনরায়। যে দীর্ঘকাল ইউনিয়ন করেছে। বাহাত্তর থেকে সাতাত্তর যে টাউনে থাকে নি, বস্তিতে থাকত। সে হয়ত টাউনকে মুক্ত করতে পারে। ভবানীবাবু, দীনুবাবু, ইরানী, মলয়, তপন, টাইগার, সবাইকে সরিয়ে।

—যা ভাবছ, সেটা ঠিক ভাবনা নয়। নির্বাচিত হয়ে এলে সবাই ভাল থাকে। আস্তে আস্তে বদলে যায়।

—এরা বদলাবে না।

—সবাই বদলায়। মানুষ তো !

—দেখুন !

—আমি আর কি দেখব বল। ভাল কথা, তোমার বোন ওই শ্যামলের সঙ্গে মিশচে কেন ?

—আমি জানতাম না। আর মিশলে বা কি ! টাউনে ওর মতো ছেলে ক'জন আছে ?

—তুমি বলচ কি ? শ্যামলরা দিনরাত আমাদের বিরুদ্ধে মিটিং করছে, জেলখাটা ছেলে ! রোজগারই বা কি ? ছেলে পড়ায়, ক্লাব করে, এখনও নকশালী মতিগতি, বুঝতে পারনা কেন ? সুধীনবাবুও ওদেরকে সন্দেহ করে।

—সকলকে ছাড়ল তো এই সরকার।

—তা বলে ওদের সমর্থন করতে পারে না।

— আমার সঙ্গে বাড়িতে কেউ কথা বলে না। আমি খবর নেব।

— নিও, খবর নিও। এদিকে দীনুর বাড়াবাড়িও দেখতে পাচ্চি।

দীনুবাবু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিল ঠিকই। দীনুবাবুর

কংরেস আনুগত্য ছিল নির্ভেজাল। দীনুবাবুর কাছে তার সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মোহনলালের হেরে যাওয়াটা একটা মর্মান্তিক আঘাত। বাহান্ন সাল থেকে সাতাত্তর, এমন ঘটনা ঘটেনি। তারপর সুধীনবাবুকে অভ্যর্থনা জানাবার কমিটিতে ভবানীবাবুর ঢুকে যাওয়াটা তার কাছে দুর্বোধ্য।

—সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে ইরানী, বুঝচ ?

—দেখছি।

—শুনচি ব্যারাকবাড়ি তুলে দেবে।

—একটা কথা বলব ?

—বল না।

—আপনি সরে যান।

—কার ভয়ে ?

—অন্তত কিছুদিন সরে যান।

—না, সরে যাব না। যদ্দিন থাকব, কংরেসকে সাপোর্ট করে যাব। এবারে ওরা স্টেশনের মাটে নাকি কালীপুজো করচে ?

—শুনেছি, জানি না।

—এ আমি হতে দেব না। আজ তিরিশ বছর আমরা ওখানে …সবাই বলে দীনু-কালী…

এভাবে, কোনো রাজনীতিক ইস্যুতে নয়, প্রস্তাবিত কালী-পুজোকে কেন্দ্র করেই দীনু নিজের প্রস্থানপর্ব সূচিত করে। পরে সব শুনে তপন বোঝে, দীনু ব্যাপারটা ঠিকই বুঝেছিল। নইলে সুধীনবাবুর সংবর্ধনা সভায় আমন্ত্রিত না হয়েও সে গেল কেন ?

সুধীনবাবু যখন বলল, আমি কথা দিচ্ছি, সমাজবিরোধীদের কবল থেকে টাউনকে সন্ত্রাসমুক্ত করব। এ কাজে আমাকে সাহায্য করবে যুবশক্তি।

দীনুবাবু ঘন ঘন হাততালি দেয়নি। কেননা সে মাঠে ভবানী-বাবু বা তপন কেউ তাকে চিনতে পারেনি।

ব্যারাকবাড়ি এসে দীনুবাবু সে রাতে খুব মদ খায়। তারপর মাসিকে বলে, তোদের ওপর চোট ঝাড়বে।

—তুলে দেবে ?

—তা দেবে না। বাঁধা আয় কে ছাড়ে ? তবে অন্য কেউ

আসচে। সন্দ' করি তপন। মলয় ভাবে আমি ছাগল। সে যে যেয়ে ওখানে জুতো ঝাড়চে তা আমি বুজি না? নইলে আজ ক'দিন তার দেকাই নেই। যখনে শুদোবে, শুনবে শরীর খারাপ। যাক, মানুষ ওঠে, মানুষ পড়ে, জগতের নিয়ম।

—তোমার কালীপুজোর চাঁদাটা?

—আমার মাটের দখল আমি ছাড়ব না। না, তোদের ঠেঙে চাঁদা নোব না। অনেক নিয়েচি।

স্টেশনের মাঠের দখল নিয়েই দীনু শেষে আসরে নেমে পড়ে। কালীপুজোর জায়গা নিয়ে একই দলের মধ্যে দুপক্ষ হয়ে যাবে, একটা প্রচণ্ড গণ্ডগোল হবে, বুঝতে পেরে নতুন কমিটি থানার সাহায্য চেয়েছিল।

—আপনারা তো প্যাণ্ডেল বাঁধছেন, যাত্রার আসর করছেন, গোলমাল কোথায়?

—দীনুবাবু গোল করবে।

—না না, সে একেবারে চুপ মেরে গেছে।

মঞ্চ হয়েছিল। ঠাকুর ওঠেনি। তবে যাত্রার আসর, বই ও খাবারের স্টল, সব ব্যবস্থা হয়েছিল। জনগণ খুব উল্লসিত ছিল। অনেক বছর বোবা মেরে আছে সব। নির্বাচনের পর লোকের মনে খুব উল্লাস। আলোকসজ্জা ও মাইকের গান আগের দিন থেকেই শুরু হয়। হেভি ফিনান্সে পুজো। ঠাকুর উঠবে পুজোর দিন সকালে।

আর রাত নটা বাজতেই টাউনের আকাশ লাল। জ্বলছে মঞ্চ, জ্বলছে প্যাণ্ডেল। ঘন ঘন বোমা ফাটে। সকলে সভয়ে দরজা বন্ধ করতে থাকে।

দীনু ও ইরানী ঘটনাস্থলে মোটর বাইকে। সব যখন জ্বলছে, তখন বাকি বোমাগুলি আনতাবাড়ি ছুঁড়তে ছুঁড়তে দীনু বাইকের মুখ ফেরায়।

তপনের সঙ্গে টাইগার ছিল। দুজনের চোখে কালো চশমা। ব্যারাকবাড়িতে দীনু আসবে ওরা জানত। ওদের পিছনে মলয়।

তপন বলে, তুমি অ্যাকশন কোর না।

—ওরা দুজন।

—স্টপ টকিং।

ব্যারাকবাড়ির গলির প্রতি দোকানের ঝাঁপ বন্ধ। ব্যারাকবাড়ির ঘরে ঘরে জানালা বন্ধ। তপন ইট মেরে রাস্তার আলোর কাচ ভেঙে দিয়েছে।

দীনু ঢুকে পড়ে। এটা তার নিজস্ব এলাকা। প্রতিটি লোক তাকে চেনে। এখানে সে কোনো বিপদ আশা করে না। তা ছাড়া এখানেও তার লোক কিছু আছে। তাদের সঙ্গেও যে মিউচুয়াল হয়ে গেছে তা দীনু জানত না।

তপন মলয়কে ঠেলে দেয়।

—দীনুদা !

—মলয়, তুই ?

দীনু নেমে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গেই অন্ধকারে মানুষ নড়তে দেখে ইরানী চেঁচিয়ে ওঠে, দীনুদা··· !

তপনের ছুরি আগে ইরানীর গলায় উড়ে এসে বেঁধে। তারপর ছুরিটা বিঁধিয়ে রেখে বাঁয়ে টেনে দিয়ে তপন দীনুবাবুর দিকে হাত তোলে। দীনু হাত পকেটে ঢোকাচ্ছে। মলয় চেঁচায়—চান্‌স নিও না তপন !

মলয়ের গলাই দীনুকে বলে দেয় সব !

—ও, তপন !

দীনুর কথাও শেষ হতে পায় না। তপনের ছুরি ওর বাঁ পাঁজরার নিচে গেঁথে যায়, ওঠে, গেঁথে যায়, ওঠে। দীনুর গায়েই ছুরিটা মুছে নেয় তপন।

তারপর মোটর সাইকেলে ওঠে। দুটি মোটর সাইকেল ঢুকেছিল, দুটি মোটর সাইকেল বেরিয়ে যায়। যাবার সময় মলয় একটি বোমা মেরে যায়, টাইগার একটি।

কে খবর দেয় জানা যায় না। পুলিশ ভ্যান এসে পড়ে। মৃতদেহ থানার বারান্দায় রাখা হয়। জনগণ দেখে যাও, জেনে যাও, টাউনের কুখ্যাততম সমাজবিরোধীরা আর নেই।

যেমন লোকের মৃত্যু, তেমন মর্যাদায় তার মৃত্যুতে উল্লাস। বোমা ফাটে ঘনঘন। ‘সমাজবিরোধীদের অন্তর্দলীয় সংঘাত ও খুন’ খবর হয়। ব্যারাকবাড়ির মাসি বলে, বদলাল কি ? নতুন

জামানা এল, মিটিন্ মিছিল হলো। কিন্তুক সেই বোমাবাজি, সেই গুণ্ডামি তো চললেই। এক দীনুবাবু গেল, আরেক দীনুবাবু আসবে।

দীনুবাবুর বউকে সান্ত্বনা দিতে ভবানীবাবু যায়।

দশ রাতের না হই, তেরাত্তিরের জ্ঞাতি তো বটি। এমন বিপদে একবার আসব না, সে কি হয়? তা বউমা! দীনুকে কত বলেচি, সামলে চল, সামলে চল, সে কি শুনল? আর যেখানে যেত, সে পাপের জায়গা...

দীনুবাবুর স্ত্রী কালো পাড় কোরা কাপড়ের আধা ঘোমটা থেকে ভবানীবাবুর দিকে উগ্র চোখে চেয়ে থাকে।

তা আমি দেখব, কাটাছেঁড়ার পর তাড়তাড়ি যাতে...

পরাজিত প্রাক্তন কংরেস (ই) সদস্য মোহনলালবাবু এসে ঢোকে সদলবলে।

—আপনি ভাববেন না। সব হয়ে যাবে। বউদি আপনাকে তো একবার থানা যেতে হয়!

কেন। ডাইরি করতে? ডাইরি করে কি হবে? তার চেয়ে অপেক্ষা করি, মানব আসুক। বাপের শেষ কাজ তো সে-ই করবে, সে যেমন বলবে তাই হবে। ভবানীবাবুকে যেতে বলুন ঠাকুরপো, আমি সইতে পারচি না।

ভবানীবাবু তবু হাল ছাড়ে না।

মায়া খবর পেয়েচে?

দীনুবাবুর স্ত্রী তীব্র গলায় বলে, বাপের হালগতি দেকে অনেককাল ছেলেমেয়েকে আমার বাপের বাড়ি রেকেচি। মেয়ে সুকে সংসার করচে বেগুসরাইতে। কি দেকতে, কি জানতে আসবে? আপনি যান। তবে একটা কতা শুনে যান। আমার স্বামী মন্দ পতে গিয়েছিল, তাতেই অমন করে মরল, যেমন মরণ শত্তুরেও না মরে। কিন্তু তাকে যারা মারল, তারাই কোন সৎপতে আছে? তারাও অমন মরণ-ই মরবে।

—তোমার একন শোকাতাপা অবস্থা বউমা, বেশি বলব না। তবে বেশি কতা না বললেই ভাল। ছেলে তো আচে।

মোহনবাবু বলে, ওঁর সঙ্গে অমন করবেন না বউদি।

বিপদ হবে।

—দীনুবাবুর বউ বলে, মানবকেও মারবে?

—অতটা মনে করি না।

—ঠাকুরপো! নয় সে নাই এল। ওর আসাটা বন্ধ করুন। আমি মুখে আগুন দোব। বিপদে সব চলে। তা বাদে অপঘাতে মৃত্যু। কলকাতা যেয়ে কাজ করব।

—এ বাড়ি?

—সব বেচে দোব ঠাকুরপো, একেনে কার ভরসায় থাকব? হোতা বিধাননগরে জমি কিনেছিলাম, যা হয় বাড়ি একটা তুলে নোব। একেনে আর নয়। আপনিই সব ব্যবস্থা করে দেবেন।

টাউনে সব থমথমে হয়ে থাকে। দীনুবাবুর শববাহী ট্রাকে মালা দেয় না কেউ মোহনলালবাবু ছাড়া। ইরানীর সাত কুলে কোন আপনজনের খবর কেউ জানত না। পুলিশ তার সৎকার করে। দীনুবাবুর সৎকার সেরে তার বউ চলে যায় কলকাতা। মোহনলালবাবুই কিনে নেয় দীনুবাবুর বাড়ি। মানব কলকাতায় কন্ট্রাক্টর। সে বিধাননগরে বাড়ি তোলে। মাকে বলে, বাবা কি কম লোক ছিল? তার ছেলে বলে আমি কত বিজিনেস পাই তা জান?

টাউন থেকে দীনুবাবু নামটি এভাবেই মুছে যায়। ভবানীবাবুর কাছে তপনের সম্মান খুব বেড়ে যায়।

টাউন তপনকে ভয় করতে শুরু করে।

বাবা-মাও ছেলের ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকে।

শুধু রেবা খুব গুমরে থাকে।

মা বলে, রেবা থাকবে না বলেছে।

—কোথায় যাবে?

—ওর কাছেই শোন্।

—সে কোথায়?

রেবা এসে দাঁড়ায়। না, ওর চোখেমুখে ভয় নেই। অন্য কিছু আছে। সেটা যে কি, তপন ধরতে পারে না।

তুই কোথা যাবি?

—শ্যামল ওষুধ কোম্পানিতে কাজ পেয়েছে।

—কি কোম্পানি ?

—ছোট কোম্পানি।

—কোথায় ?

—কলকাতায় অপিস। ঘুরতে হবে।

—ওকে বিয়ে করবি !

—রেজেস্টারি করে এসেছি।

—বিয়ের ব্যাপাটা সেরে যা।

—না, শ্যামল বলেছে গেলে সব ছেড়ে যেতে হবে। এখানের সঙ্গে সম্পর্কও ও চায় না ; যাওয়া-আসাও চায় না।

—এত বড় কথা ?

—আমিও চাই না দাদা।

—তুই ! তোর এত বড় আস্পদ্দা ?

—কি করবে, মারবে ? তাই মারো।

তপন ভীষণ আঘাত পায়। তোকে আমি মারব, তাই ভাবলি ?

—আর কি ভাবব ?

—আমি তোর দাদা···

—আমি বাবা, মা, তুমি, কাউকে চাই না। বারো বছর বয়স থেকে পরের ভাত খাচ্ছি। কে আমায় দেখেছে ? আমি সংসার চাই, টাকা চাই না দাদা।

—ও, আমার টাকা চাস না !

—কারো টাকাই চাই না।

—বিয়ের কাগজ কার কাছে ?

—আমার কাছে।

—কবে রিজেস্ট্রি হলো ?

—যেদিন ভরত মরল !

—ও।

—আমি অন্য জায়গায় একটা সম্মানে বাঁচতে চাই। এখানে দম বন্ধ করে··· তুমি বাধা দাও, আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব।

তপন নিশ্বাস ফেলে।

—তা করবি কেন ?

—সুকু বুকু কেন চলে গেছে বোঝ না ?

—বুঝি। যা, তুই যাতে ভাল থাকিস, তাই কর গে, কলকাতা, বাসা ভাড়া…

কেন, বস্তিতেও মানুষ থাকে।

শ্যামলকে বলব না কিছু?

কেন বলবে? আমার বয়স বাইশ, ওর সাতাশ। তুমি জানতে না, নইলে টাউনে সবাই জানে যে আমাদের বিয়ে হবে।

—আমি থাকলাম কোথায়, যে জানব? শ্যামলকে বলিস, টাউনে যেন যায়-আসে সাবধানে। ভবানীবাবু ওকে পছন্দ করে না।

—একবার বেরোক, আসবেও না।

দুজনে একসঙ্গে যাস না! জানাজানি হবে। রেবা! আমি বাড়ি ছেড়ে গেলে কোনো সাহায্য হবে?

আমি তো চলেই যাচ্ছি।

রেবা দুদিন বাদেই চলে যায়। কোন শাড়ি নয়, গয়না নয়, মাথা তুলে বেরিয়ে যায়।

মা বলে, সংসার ওরা পেতে নেবে। আমার রোজগারের টাকা থেকেই দিলাম দুশো।

রেবার ব্যাপারটা তপনের কাছে একটা প্রচণ্ড অভিজ্ঞতা। ওর মনে হয়, এক বাড়িতে থেকেও ছোটবেলা থেকে নিজেকে আর পরিবারকে ঘেন্না করে বড় হয়েছে তপন। কখনো ভাইবোনদের কথা ভাবেনি। ভবানীবাবু যেদিন প্রথম টাকা দেয় সেদিন মাকে ও বলেছিল বটে, রেবাকে ছাড়িয়ে আনো, সুকু-বুকুকেও।

কিন্তু তপন বুঝতে পারছে টাকা দিলেই সব হয় না। তপন ক্রমেই অন্যরকম হয়ে যায়। এই অন্যরকম হওয়া ছাড়া হয়তো তার অন্য উপায় ছিল না।

কিন্তু ওর ভাইবান, এই পরিবর্তিত তপনের আনীত সচ্ছলতায় মুগ্ধ হয়ে অন্যরকম জীবন বেছে নেয়নি।

দাদা যখন সত্যিই 'দাদা', তখন সাধারণত ভাইবোনেরা তার গরমে ফুলেফেঁপে ওঠে।

তপনের ভাইবোনরা তেমন হলো না।

সুকু চলে গেছে রানাঘাটে। ওর রেডিও সারাবার ও ইলেকট্রিক

সংক্রান্ত কাজকর্মের দোকান ছোট হলেও চলে।

বুকু বনগাঁয় বাংলাদেশ থেকে আনীত জামাকাপড় বেচে। মা ছেলেদের দেখে এসেছে।

রেবা চলে গেল। শ্যামল নিশ্চয় বলেছে, অতীত পরিচয় মুছে ফেলে এসো।

বলতে পারে। চম্পক আর শ্যামল জেল থেকে ফিরেছিল। কিন্তু চম্পককে তো মলয় খুন করেছে।

চম্পকের গড়া প্রেসকর্মী ইউনিয়ন শ্যামল চালাত। শ্যামল ইউনিয়ন ছেড়ে চলে যাচ্ছে?

মা বলল, কি করবে? এখন সুধীনবাবুর দলের ছেলেরা সব জায়গায়। ইউনিয়নগুলো তো ওরা আগে নেবে।

কে সেক্রেটারি হলো?

তপন আস্তে বলে।

—তীর্থ। সুধীনবাবুদের পার্টি করে। মরতে মরলাম আমরা। শ্যামল থাকলে…

কি করত?

—আমাদের, হাসপাতালের কর্মীসেবিকা মেয়েদের একটা ইউনিয়ন হতো।

—তুমি তো আর যাবে না সেখানে।

—অন্যেরা উপকার পেত। আমি বা বাড়িতে সময় কাটাই কি করে। রেবাও চলে গেল!

—ছেলেদের কাছে যাও।

—তপন, একটা কথা বলব?

—কি?

—সুকু একটু বাড়াতে চায় দোকান।

—বুকু কি চায়?

—যার সঙ্গে বিজনেস করে, তার বোনকেই বিয়ে করতে চায়। হাত পুড়িয়ে খায়।

তপন কপালের রগ টিপে ধরল।

—তাদের যদি মন থাকে আপত্তি না থাকে, বলবে কত লাগবে, টাকা দেব।

—আপত্তি কেন করবে ?

করবে না ? ভালই তো। মা! বিয়ে তুমি দুজনেরই দাও। তোমার যাওয়া-আসার জায়গা হবে। আর, আর শ্যামলদের বাড়ি থেকে ঠিকানা জেনে রেবাকেও দেখে এসো মাঝে মাঝে।

—তুই অমত করবি না ?

—কেন করব ? রেবা তো অন্যায় করেনি, অন্যায় বলেওনি। আর শ্যামল আমি নয়। সে মানুষ।

মা চুপ।

—তোমার ভাবনা তুমিই ভেব মা। আমি বড়জোর টাকা দিতে পারি। আর কিছু পারি না।

—তোর বাবা বলে···

—বাবার কথা বলনা। বাবা কার কথা কবে ভাবল যে আমি তার কথা ভাবতে যাব ?

হ্যাঁ···সত্যি কথা।

—বউ হাসপাতালে ঝি, মেয়ে পরঘরে রাঁধুনি···সে আন্দাজে তোমার অন্য ছেলেমেয়েরা তো মানুষ হয়েছে মা।

মনে মনে বলে, তোমার জন্যে, তোমার জন্যে। তুমি যা করেছ সব ঠিক কাজ। আমি যা করলাম, তার সব ভুল।

—মা !

—কি ?

—তোমার চলে যেতে ইচ্ছে করে না ?

—না, তোর তো কেউ রইল না।

—আমার জন্যে ?

—চারটে ঘর, তাই যেন খাঁ খাঁ করছে। সব যেন গিলে খেতে আসছে।

—তুমি ছেলেদের কাছেও থাকতে পার। আমি টাকা পৌঁছে দেব।

—না তপন, তোর জন্য চিন্তা হয়।

—আমার জন্য ? আমি কোনদিন তোমার কথা ভাবলাম না, তুমি আমার কথা ভাব ?

—ভাবি। ক্ষমতা ছিল না, কিছু করতে পারিনি তোর জন্য।

তপন অবাক হয়ে ওর মার দিকে তাকায়। কাজ করে করে শক্ত, দড়াপাকানো শরীর, অত্যন্ত কুশ্রী মুখ, চুল উঠে যাওয়া চওড়া সিঁথিতে সিঁদুর- এই স্ত্রীলোকটি তার কথা ভাবে ?

তপন মাথা নাড়ল। আজ আর এ সব কথা চিন্তা করাও সম্ভব নয়। তপনের মধ্যবর্তী জীবনটা যদি স্বাভাবিক হতো, তাহলে ভাবতে পারত।

—তোর বাপ যদি মানুষ হতো···এতদিনে তোরও চাকরি হতো।

চাকরি ! তপন তো ভবানীবাবুর কাছে একটা কাজই চেয়েছিল।

—বেরোবে নাকি ?

—দেখি। শোন। বাইরের ঘরটায় কেউ শুয়ো না। আমি পেছনের ঘরে শোব।

তপন রাস্তায় সিগারেট কিনতে গেল। চেনা দোকানী। তপন টাকা দিতে গেল। দোকানী মুখ নামিয়ে বলল, থাক।

· তার মানে ?

—দিতে হবে না।

তপন বুঝল, দোকানী কেন, টাউনে সকলে জেনে গেছে সত্যি খবর। দীনুবাবু নেই। ভবানীবাবু ঝাণ্ডা বদল করেছে। তপন এখন টাউনে "বস্"। মনে পড়ল, বস্ বা তার লোকজন কনখও সিগারেটের বা চা-র দাম দেয় না। বাজার থেকে, টাউন থেকে তোলা ওঠায়। জনসাধারণকে পিষে মারে।

তপনকে দোকানী যেন চড় মারল।

তপন বলল, পয়সা নেবে। মস্তানি করে বিনে পয়সায় কেউ প্যাকেট তুলে নিলে আমাকে বলবে।

দীনুবাবু নেই, তপন এখন টেক ওভার করেছে নিশ্চয়ই। কিন্তু তার মানে এই নয় যে তপন গ্যাং নিয়ে টাউন থেকে তোলা উঠিয়ে বেড়াবে।

তপন তখনো জানে না, টেক ওভার আরেক রকমও হবে কয়েক বছরে। রাজনীতিক ঝাণ্ডার নিচে যারা ঢুকবে, তারাও বস্ হবে। কি উগ্র শোষণ চালাবে জনজীবনে, কি আতঙ্কের গ্রাসে রেখে দেবে মানুষকে, তা তখনো তপন জানে না। জানে না যে, যে

'সমাজবিরোধী' শব্দে এত ঘৃণা এখন, রাজনীতিক ছেলেদের ওপর যে ভক্তি, সমাজবিরোধী ও রাজনীতিক ছেলের মধ্যে যে পরিষ্কার বিভেদরেখা, তা একদিন মিলেমিশে যাবে। রাজনীতিক স্তরে নিচের পর্যায়ে শত সহস্র সমাজবিরোধী ঢুকে যাবে।

ভবিষ্যৎ তো দেখা যায় না।

তপন নিজেকেই ঘৃণ্যতম পাপী বলে মনে ভেবেছিল। নেতার কথায় যে খুন করে, সে ভাড়াটে খুনী ছাড়া আর কি?

এটাও তপন জানত, সে নিজে আর বেরোতে পারবে না। দীনুবাবু বলত, আমরা কেউ বিছানায় শুয়ে মরব না। লাইন হলো এমন জিনিস।

## ॥ দুই ॥

ভবানীবাবু বলেছিল, কলকাতায় দেখা করবে।

ও. সি, বলছিলেন, কিছু ধরপাকড় হবে।

—সে তো হবেই। সমাজবিরোধী দমন কর, এ তো আমরাই বলছি।

—তবে?

—তোমার তাতে কি? ও নিয়ে তুমি ভেব না।

তপনের বলতে ইচ্ছে হলো, আপনিও বাইরে, আমিও বাইরে। তবে কোন সমাজবিরোধীকে ধরবে পুলিশ?

বলল, না। সময় নয়, এখন সে সময় নয়।

—দীনুর কেসটা শুনেচ?

—কি শুনব?

—জগদ্দলে বোমাবাজি করে এসেছিল। তারাই ওকে মেরে রেখে গেছে।

—সে তো সত্যি নয়।

—দীনু মরতই। ও নিয়ে তুমি ভেব না। মনটা খোলসা রাক তপন। অমন কাজ করতেও হয়, ভুলেও যেতে হয়। এখন কাজের কথা।

—বলুন।

—কলকাতায় এলে সব কথা হবে। তবে একটা কথা এখনি

বলা দরকার। শ্যামলকে যেতে দিয়ে ভাল করলে না।

—শ্যামল রেবাকে বিয়ে করেছে। তা ছাড়া এখানে যে সব ইউনিয়ন, হেনতেন করছিল, সে সবও আর করতে পারবে না।

—তা পারবে না। বিয়ে করেচে ?

হ্যাঁ। আমি বিয়ের কাগজ দেখেছি।

দেখ ! তোমার বোন···

তপন বুঝল, ভবানীবাবুর সঙ্গে আর যা হোক, খোলামনে কথা বলা নিরাপদ নয়। ও বলল, আমি শাসিয়ে দিয়েছি। টাউনে আর ঢুকবে না।

তোমার বোন ! কত ভাল বে' হতে পারত।

— ওদের ছেলেবেলা থেকেই···

ও, লাব্‌ ? ভাল, লাব্‌ খুব ভাল।

ভবানীবাবু হাসল। মাঝে মাঝে ভবানীবাবু এমন হাসে। আর সম্পূর্ণ কাল্পনিক সব কথা বলে, যা নিজেও তখনকার মতো বিশ্বাস করে। ভবানীবাবু বলল, আমার মতো ব্রহ্মচারী হয়ে কে থাকবে বল ? ঘরে লক্ষ্মী এনেছিলাম, আগুনে পুড়ে সে চলে গেল ! ছিল, বে'র বয়স ছিল। বেটাছেলের আবার বে'র বয়স ! করলে করতে পারতাম। কিন্তু ভেবে দেকলাম সেটা আর হয় না। তাকে তোমরা দেকনি।

— দেখেছি ছোটবেলায়। পুজোমণ্ডপে যেতেন। আমাদের সরস্বতী পুজোয় চাঁদা দিতেন।

ধম্মপ্রাণ মানুষ ছিল। হবে না, কত বড় ঘরের মেয়ে, কোন ঘরে বে' হয়ে এসছিল !

—হ্যাঁ।

—যাগ গে, সে জন্যেই পাবলিক লাইনে চলে গেলাম। দীনুর বাড়িটা মোহনলালই কিনল !

—শুনেছি।

—এদ্দিনের বসবাস উটে গেল। যাক গে ! কত বল্‌লীচ দীনুকে, বুজিয়েচি।

টাইগার, মলয় ও তপন চুপ। এ কথার উত্তরে কি বা বলা যায় ?

— হীরকের পসপেট আচে। ওকে শিকিয়ে নিলে···

—আপনি যা বলবেন !

—কলকাতায় বসে কতা হবে। একেনে এট্টা লাইন ভাগাভাগি করে চলতে হবে। নয়া জামানা, নতুন নীতি এট্টা দরকার হবে। আমি সব বলে দোব। দীনুর বউয়ের কীত্তি শুনেচ। সে রানী রাসমণি হয়েচে যে।

—কি রকম ?

—রাঁদুনি, ঝি, দরোয়ান, ডাইভার সগলাকে দু-পাঁচ হাজার করে টাকা দিয়েচে। বলেচে, ওরা খুব বিশ্বেসী ছিল। দীনুর বউকে রক্ষে করত।

—তারা কোথায় গেল ?

—সব সরে পড়েচে। সরিয়ে দিল আর কি ! দীনুর কীর্তি-কাহিনী সব ওরা জানে তো !

তপন অপেক্ষা করতে থাকল।

—তোমায় তেমন খুশি দেখচি না। মনটা খারাপ ?

—না, মাথাটা ধরেছে।

—তবে পশ্যু চল এসো টাইগারের সঙ্গে। টাইগার গাড়িটা সাভ্যিস করাতে যাবেই।

—কখন আসব ?

—সকালে চলে এসো। ওখানেই খেয়ে নেবে। বউদি কি না খাইয়ে ছাড়বে ? সে পাত্তর নয়।

তপন বেরিয়ে এল। ভবানীবাবুর নিজের ভাইরা কে কোথায়, কেউ জানে না। টাইগার বলেছে, ভবানীবাবু কলকাতায় যাঁকে ভবানীপুরে বাড়ি কিনে দিয়েছে, সেই রেণু বউদি আসলে লাইনের মেয়ে। ভবানীবাবু তুলে এনেছিল, অনেককাল রেখেছে তাঁকে। ওঁদের দু মেয়ে হয়েছিল, ভবানীবাবুই বিয়ে দিয়েছে। ভবানী-বাবুর বিষয়-সম্পত্তি তারাই পাবে, তাতে সন্দেহ নেই।

তপন বলেছিল, তুমি এত জানলে কি করে ?

—উনি যেমন আমার সব্যস্য খবর রাখে, আমিও ওনার খবর রাখি। এটা হল ইনসিওরেনস। আমি যে সব জানি, এ কথাটা উনি জানে। ওটাই আমার ইনসিওরেনস। যে সব জানে, সে পাঁচজনাকে জানাতে পারে। তাকে চট করে ভরত করে দেবে না।

এখন সময় খুব মন্দ দাদা, সকলে সকলের খবর রাখে।

—আমাকে এ সব বলছ কেন ?

—তোমার কাছে একটা ভিক্ষে আছে।

—কি বলছ ?

—নাইফিংটা শিখিয়ে দেবে।

—টাইগার !

—কি জিনিস !

—তুমি তো বন্দুক চালাও।

হ্যাঁ, তবে ছুরি অনেক ভালো।

—আমি একসময়ে ঘুরেছিলাম রোহনলালের সঙ্গে। সে এখান থেকে শেয়ালদা ছোরা ছুঁড়ে খেলা দেখাত। তার মেয়ে দাঁড়িয়ে থাকত, রোহনলাল ছোরা ছুঁড়ত বোর্ডে।

—ওই খেলা দেখাতে ?

—খেলা দেখাইনি। শিখেছিলাম।

মনে মনে বলল, খেলা তো এখন দেখাচ্ছি।

—ভবানীদা বলে তুমি অল মাস্টার। চেম্বারও না কি চলে, সব পার।

—লাইনে থাকতে গেলে টাইগার·· তা ছাড়া আমি এই টাউনের রাস্তায় ছোটবেলা থেকে গুন্ডাগিরি করে বড় হয়েছি।

- সব জানি। যাক গে, মনে রেখো কথাটা।

হ্যাঁ। সময় তো পড়ে আছে।

- গার্ড না নিয়ে চলাফেরা করছ !

—ইরানী দিনুবাবুর গার্ড ছিল।

—ও সব হলো কপালের লেখা। তবে বুঝে চললে বিপদ আসে না। ভবানীদার ওপর তো কম অ্যাটেম করেনি নকশালরা।

যা বলেছ। আমি এগোই।

বুঝে চললে, কি বুঝে চললে বিপদ আসবে না ? বিপদ কার কখন আসবে, কে জানবে ! আজ, হঠাৎই রেবা চলে গেছে বলেই শ্যামলের কথা, চম্পকের কথা মনে পড়ে তপনের। জেলে, পুলিশের অত্যাচারে চম্পকের কাঁধের হাড় ভেঙে গিয়েছিল। হাসপাতালে নেয়নি। চিকিৎসা হয়নি। বাঁ হাতটা ঝুলে

গিয়েছিল। টাউনে এসে তারপরেও চম্পক প্রেসকর্মীদের ইউনিয়ন করল।

দিন দশ টাকা মজুরির দাবিতে ধর্মঘট করেছিল ওরা। বাড়ি ফেরার পথে চম্পককে মলয়ই মেরে ফেলে ?

চম্পকের দেহ নিয়ে ছোট হলেও খুব সম্মানিত শবযাত্রা বেরিয়েছিল। লাল কাপড়ে মোড়া, সঙ্গে টাউনের ছোট-বড় এগারোটি প্রেসের কর্মীরা, শ্যামল, সৌরভ। তপন দূর থেকে দেখেছিল। এ টাউনের যে কটি ছেলে ধরা পড়ে, তার মধ্যে কাজল সে সময়েই খুন হয় উত্তরবঙ্গে। কাজলদের বাড়ির লোকজন টাউন ছেড়ে চলে গেছে। কাজলের বোন গৌরীও জেল খেটেছে। সে নাকি কলকাতায় এক কলেজে পড়ায়।

চম্পকের সঙ্গে বিয়ে হবার কথা ছিল স্বাতীর। কিন্তু স্বাতী পরে বিয়ে করল সৌরভকে।

ওরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই কলকাতায় কি একটা বিজ্ঞাপনের ছোট অফিস করেছে।

ছিল শ্যামল। শ্যামলও চলে গেল।

তপন কেন ওদের কথা ভাবছে ? ভাড়াটে গুণ্ডা, ভাড়াটে খুনী কেন ওদের কথা ভাববে ? শ্যামল যে রেবাকে এত কিছুর পরেও বিয়ে করল এটাই তো আশ্চর্য। হয় তো রেবা বেঁচে যাবে। অন্য রকম একটা সুস্থ জীবন পাবে।

বাড়িতে মা খাবার নিয়ে বসেছিল।

শুধু তরকারি আর বেগুনপোড়া। খেতে পারবি ?

—কে, আমি ? খুব পারব। তুমি জেগে বসে থেকো না মা, যাও, শুতে যাও।

বাড়িতে বসবাস ছাড়তে হবে। বাড়িতে থেকে মাকে উৎকণ্ঠায় রাখা ঠিক নয়। তপন না থাকলে ছেলেদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে নিয়ে মা ঠিক থাকতে পারবে।

আজ যে ঘরে তপন শুল, এটা ছিল রেবার ঘর। ঘরটা গোছানো, পরিষ্কার। শেলফে ইতিহাসমালা, ভূগোল পরিচয়, ইংরেজি গ্রামার বই।

—রেবা পড়ত ?

—হ্যাঁ, পড়ত। স্কুলের পড়া তো হয়নি। বাড়িতে পড়ে পরীক্ষা দেবার ইচ্ছা ছিল।

—শ্যামল পড়িয়ে নেবে।

—শ্যামলের উৎসাহেই তো···

—এ সব টেলারিঙের বই ?

—ওতো শিখতে যেত। ব্লাউজ ছাঁটতে শিখেছে। বলত, একটা কল পেলে আমি রোজগার করতে পারি। আমিও তাই বলতাম।

তপন কিছুই জানত না।

রেবা এ সব কথা বলত ?

— বলবে না ? ছোটবেলা থেকে আমায় খাটতে দেখেছে। আমি আরো খানিক লেখাপড়া জানলে তো নার্সের কাজও শিখতে পারতাম। মেয়েছেলে খেটে খাবে, তার মতো ভাল কি আছে ? কত রুগীকে সেবা করেছি।

মার কাজ সম্পর্কে তপনের ধারণা খুব নিচু ছিল। মা যে নিজের কাজটির বিষয়ে গর্ববোধ করে এ কথাও তপন জানত না।

তুমি কল চালাতে জান ?

—আমি আর জানলাম কেমন করে ? কিনব বলে ইচ্ছা ছিল, পারিনি। তখন পারিনি। এখন তো জীবন শেষই হয়ে এল। চোখেই ঝাপসা দেখি।

আশিসবাবুর কাছে চোখ দেখিয়ে নিও মা !

—অত বড় ডাক্তার ! হাসপাতালে···

—হাসপাতালে মেশিনপত্তর কিছু নেই।

তাই যাব।

—আর কি ইচ্ছা করে ?

কিছু না তপন। ওরা···ভাল থাকবে, জানি। তুই ভাল থাক্।

—আমি ভালই থাকব মা।

না, তপনকে সরেই যেতে হবে। মা শেষ জীবনটা যেন শান্তিতে থাকে।

—তপন !

—কি ?

—কোন ব্যবসা-কারবার করলে···

—আর হয় না মা। আমি নষ্ট হয়ে গেছি। আমাকে তুমি কোন প্রশ্ন কোর না।

পরদিন গাড়িতে উঠেই তপন বুঝল, টাইগারের কাছে তার অন্য সম্মান এখন। সারাটা পথ ও তপনদা জল খাবে ? চা খাবে ? বলতে বলতে চলল।

ভবানীপুরে গোপাল ব্যানার্জী রোডে তেতলা বাড়ি। পুরনো বন্দেজের পোক্ত গাঁথনি, দোতলার বারান্দায় টালির শেড। গেট খুললে একফালি বাগান চোখে পড়ে। বাড়ি ঢোকার মুখে দারোয়ান। বারান্দায় কোলাপসিব্‌ল গেট। টাইগার চাপা গলায় বলল, অ্যালাম সিস্টেম জবর। ওপরে বেল টিপবে তো ঘরে ঘরে বেল বাজবে। সাবধানে থাকে, নইলে চলে না।

গেটের মুখে, বারান্দায় দেহরক্ষী। তপনরা যে ঘরে বসল, সে ঘরের জানালায় লোহার জাল, কাচের রং নীল। মস্ত ঘর। কোণে টেবিল চেয়ার। আর কয়েকটি সোফা। টাইগার বলল, ভবানীদার নিজের চেয়ার ওপরে।

চটি চটপটিয়ে ভবানীবাবু নেমে এল। বলল, এখানে কেন ? ওপরে চলো। দোতলাটা আমার। তেতলায় বৌদির সংসার।

দোতলার ঘরের সাজসজ্জা একই রকম। তবে দরজায় কোলাপ-সিব্‌ল গেট। ঘরের দেয়ালে গাঁথা সার সার লকার।

—কি রকম দেখছ তপন ?

—ভালই তো।

—কপালে হয়, কপালে। জান তো রেসের নেশা সর্বনাশা। রেসের মাঠে ফতুর হয়ে ভদ্দরলোকের ছেলে এই বিশাল সম্পত্তি, চার কাটা জমির ওপর তেৎলা বাড়ি ত্রিশ বছর আগে আমার কাছে মটগেজ রাখে। সে আর ছাড়াতে পারলই না। ঘোড়ার ল্যাজে কলকাতার দুটো বাড়ি, ফিলমের বিজিনেস উড়িয়ে দিল। এ সংসারে আসতে যেমন, যেতে তেমন !

—বলুন !

—হবে হবে, আগে আমার বাগান দেখ। বারান্দা থেকেই

দেকতে পাবে। জবা, গাঁদা, অতসী, দোপাটি, করবী, শিউলি, বেলপাতার গাছ। কোনটা নেই? ছাতে ঠাকুরঘর। বউদি লক্ষ্মীজনার্দন পিতিষ্ঠে করল। পুজোর ফুল সব। টাউনের বাড়িতে এককালে দুর্গোচ্ছব হতো, সে বাবার আমলে। একন আর···! এই যে!

দুজন দাসীর হাতে জলখাবারের থালা দিয়ে সঙ্গে বউদি ঢুকলেন। টাইগার বলেছিল লাইনের মেয়েছেলে। তপনের মনে হলো ইনি বোধহয় অভিনেত্রী ছিলেন। ফর্সা রঙ, গোলালো মাখন মাখন শরীর দুধগরদে ও স্বর্ণালঙ্কারে ঢাকা। ভুরু প্লাক করা। চুলে কলপ।

—এটুু জল খেয়ে নাও।

লুচি, তরকারি, পায়েস, মিষ্টি।

—এত?

সবই আমার ঠাকুরের ভোগ। দুপুরেও নিরিমিষ খাবে। এ বাড়িতে আমিষ ঢোকে না। ·ঠাকুরপো বাইরে যা মন চায় খেয়ে আসে। তারক, খাও? এনার নাম তো জানলাম না।

—ওর নাম তপন।

—বাঃ! কি চেহারা! জামাই কত্তে সাদ যায়। তা দুটি বই তো মেয়ে নেই। জামাইরাও হয়েচে রাজপুত্তুর। দেকাব, ছবি দেকাব।

ভবানীবাবু বলে, খাও খাও। কাজ আচে।

—আপনি খাবেন না?

—সকালেই, সুধীনবাবুর সঙ্গে···

—আর ক'খানা লুচি আনুক?

—না না, আর পারব না।

—তোমার বয়সে ঠাকুরপো তো···

—এখন কেউ অত খায় না। তুমি খেয়েচ?

—আমি? একন? সকালে দুদ মিছরি ছাড়া আর কি খাই? দুপুরে একমুষ্টি। খেয়ে খেয়ে তো এই অবস্তা। মেয়ে নে' গেল মসুরি পাহাড়ে। তা হাঁটতেই পারি না।

ভবানীবাবু বলল, যোগ-ব্যায়াম করো।

—থাক ! এ বয়সে যোগ-ব্যায়াম ! মোটার ধাত, মোটা হচ্ছি। ঠেকিয়ে কি হবে ?

একটু কাজকর্ম করো সচল থাকো।

—ও বাবা ! ঘরের কাজ জন্মে করিনি, পারব না। সচল তো থাকি। সমানে বেরোচ্চি, সিনেমা দেখচি, সেটা কি ঘরে বসে হয় ? কাজের মানুষ তুমি, কাজ কর। আমার কতা ছেড়ে দাও।

কেন যেন চেনা চেনা লাগছে মহিলাকে, তপন ঠিক মনে করতে পারছে না।

—উঠি, তোমার কাজের কথা বলো। দেখ ! এখেনে সব নিরিমিষ, কষ্ট হবে না তো ?

—না না, কষ্ট কিসের ?

—তুমি অনেক বার খেয়েচ তারক, এনাকে বলচি।

—না, কষ্ট হবে না।

বেশ চেহারা, ঘরে সবাই আচে ?

ভবানীবাবু বলল, ওদিকে দেক গে এট্টু। আমাদের কাজ আচে, কাজের কতা আচে।

সে তো থাকবেই। কাজ গেলে বেটাছেলের জীবনে কি রইল আর, বলো না !

ভবানীবাবুর রেণু বউদি গজেন্দ্রগমনে বেরিয়ে যান। তপনের মনে পড়ে। টাইগারের ভগ্নীপতির যে গ্যারেজে অংশ আছে, সেখানে ভবানীবাবুর গাড়িও ভাড়া খাটে। ওখানেই একদিন এঁকে গাড়িতে বসে থাকতে দেখেছিল। চোখে কালো চশমা ছিল।

—দরজা বন্দ করো টাইগার। তপনের সঙ্গে কতা আচে। তপন এত গম্ভীর কেন ?

—আমি আর হাসিখুশি কবে ছিলাম ভবানীদা ?

'ভবানীদা' বলবে, টাইগারের নির্দেশ। ভবানীবাবু 'দাদা' ডাকটি পছন্দ করে। টাইগার এ কথাও বলেছিল, কথা প্যাঁচাতে ওস্তাদ লোক। খুব সাবধানে কথা বলা দরকার। কথা প্যাঁচাতে জানত না বলেই দীনুবাবু ফেঁসে গেল।

তপন ভেবে পেল না এখন সে কি করলে ভবানীবাবুর মনে হবে সে সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য এক লোক ? খোশামোদী করা

তপনের তেমন আসে না। আর, যে লোকের কথায় সে খুন করেছে, সে এবং তপন পরস্পরকে বিশ্বাস করবে এটা কেমন করে ভাবা যায়? সেটা অবাস্তব।

- কিচ্চু ভেবেচ তপন?

—আমি কি ভাবব?

ভাববে না? তোমরা তরুণ, তোমাদেরই তো আইডিয়া থাকবে নানারকম। আমরা এখন বুড়ো যোগী।

আপনার অভিজ্ঞতা অনেক বেশি।

একন খুব বুজে সমজে চলতে হবে। নতুন সরকার···

একটা কথা জিগ্যেস করব?

—করো না।

সুধীনবাবুরা অন্য রাজনীতি করত। ইউনিয়নের নির্বাচনে ওরা জিতত। মানুষের মনে ওদের ওপর সমর্থন খুব, সেটা পথে-ঘাটে দেখা যাচ্ছে। ওরা আমাদের মানে আপনার লোকজনদের কাজকর্ম সমর্থন করবে কেন? আপনাদের ভোটে হারিয়ে ওরা ক্ষমতায় এসেছে। সাধারণ মানুষের কি আনন্দ, দেখতে পাচ্ছি তো।

ভবানীবাবুর চোখ করুণায় নরম হয়ে যায়।

—পলিটিস করেছ, অথচ চালটা বুঝলে না?

- পলিটিকস আমি করিনি ভবানীদা। যে করত চম্পক।

—ফুটে গেছে।

—কাজল রাজনীতি করত।

—ছাড়ো তো ওসব কথা। কাজের কথায় এসো। হ্যাঁ, আমি বিরোধী ছিলাম, এখন ভুল বুঝতে পারছি।

- সেটা ওরা মেনে নেবে?

—ওরা এখনো সিদেসাদা। আমাদের নাগাল পাবে কি করে? পাকা হয়নি, চক্কর বোঝে না। ওরা দেখতে চায় কে ওদের সমর্থক, কে নয়।

—আপনি তবে···?

—আমিও ওদের সমর্থক।

—আপনি এখন আমাদের, আমাকে, কি ভাবে ব্যবহার করবেন?

আমি তো পথ জানতে চাইছি।

—বুঝে চলতে হবে। সুধীনবাবু নির্বাচিত হয়েচে ঠিকই। কিন্তু ইউনিয়নে লালটু বসুর ইজ্জতও খুব ছিল। লালটুবাবু এর আগে দাঁড়াত, ভোটও পেত, জিততে না পারুক। এটা জেনো যে ওদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই এট্টা থেকে যাবে।

—সে তো ওদের ব্যাপার।

—ঐক্য থাগলে আমাদের ফাংশান করা মুশকিল হতো। বিভেদ থাগলে আমাদের ভাল।

—যা যা চলছিল, সবই চলবে ?

—কি চলবে না বল ? কংরেস ইউনিয়নে থাগবে রামাধারী সহায়। সুধীনবাবু তো আর ইউনিয়ন কত্তে পারবে না তেমন। লালটুবাবু যেমন পারবে, করবে।

—আপনি ?

—আমি যেমন ছিলাম তেমনি থাকব। লালটুবাবুর ইউনিয়নে একন যাচ্চি না। পরে পরামশ্যদাতা ঠিগই হব। লেবার লাইনে অভিজ্ঞতাটা আচে তো !

হ্যাঁ, লেবার স্ট্রাইককে বেআইনী ঘোষণা করলে ব্ল্যাকলেগ, স্ট্রাইক ব্রেকার ঢোকাবার অভিজ্ঞতা। ভবানীবাবু মঞ্চের নেপথ্যে থাকলেও মিলমালিকের লাভ।

—ভাবতে তো হবেই তপন। বাজারে নাইলন সুতো ঢুকে যাবে, পাট আর ক'দিন থাকবে ? আমি বলে দিচ্চি তোমায়, কলকারখানা লাইনে দুর্দিন আসবেই। আজ না হোক, কাল। সরকার যেই হোক, কাজ করবে তো আমলারা। তারা সব রাতারাতি গরিবের ভালাইয়ে লেগে যাবে ? ছোঃ !

—একি বলছেন ? কলকারখানা এলাকা।

—পাওয়ার, মানে ইলেট্রিক চাই। লেবার ক্ষ্যাপা চলবে না, তবে তো মিল কারখানা-মালিকরা সব চালাবে। তারা তো মানুষকে ভাত দেবার জন্যে কারখানা চালায় না। মুনাফার জন্যে চালায়। এক নকশালীতে ভয় পেয়ে কতজনা পাত্তাড়ি গুটিয়েছিল মনে নেই ?

—তাহলে ?

—কিছু ভাল হবে, কিছু মন্দ হবে। তোমার তো পলিটিসে দরকার নেই। দীনু নেই, তুমি একন বস্। সেটা মনে রেকো।

—আপনি থাকতে…

—আমি চিরকাল পেচনে থাগব। দীনু থাগতে দীনুকে সবাই দেকেচে, আমাকে দেকেনি। আর, আমি একন কলকাতাতেই বেশি করে থাগব। পলিটিস হবে কলকাতায়। একন একেনে বসে থাকা বোকামির কাজ।

হ্যাঁ, তাই সত্যি। দীনুবাবুকে দেখা যায়, দীনুবাবুর মুখ আছে। দীনু মস্তান, দীনু খুনে, দীনু কালীপুজোয় সবাইকে নিয়ে ধুমধাম করে। দীনু ব্যারাকবাড়ি যায়, মদ খেয়ে, বাড়ি ফেরে। দীনু নেতাজী দিবসে বাচ্চাদের নিয়ে প্যারেড করায়। দীনু মস্তান পোষে। টাউন ক্লাবে ছেলেরা ফুটবল খেললে দীনু ওদের কলকাতা নিয়ে যায় বড় বড় ম্যাচ দেখাতে। দীনু ফেসলেস নয়, তাকে দেখা যায়। সে রক্তমাংসের মানুষ।

রক্তমাংসের মানুষ বলেই তার ছায়া দেখা যায়। ছায়া তো কায়ার সঙ্গে চলে। ইরানী দীনুর ছায়া। তাকেও দেখা যায়। একদিন ওরা দুজনকেই দেখা গিয়েছিল পড়ে আছে। রক্তাক্ত, সবাই দেখেছিল। দীনুর ফ্রন্ট ছিল না, মুখ ছিল।

ভবানীবাবু চিরকাল পেছনে থাকবে।

সে ফেসলেস, তার ছায়া নেই কেউ। সে নিজেই নিজের ছায়াকে তৈরি করে, ছড়িয়ে দেয়। তার ছায়া সর্বত্রগামী!

ভবানীবাবু অঙ্কের নিয়মে চলে।

সুধীনবাবু ও লালটুবাবু তার বিপক্ষে ছিল। লালঝাণ্ডা পার্টি। মালাধারী সহায় ফ্রন্ট, কংরেস দলের ইউনিয়ান করে।

আজ ভবানীবাবু সুধীনবাবুদের সমর্থক। কিন্তু মালাধারীও থাকবে। ওদের ঐক্য ভবানীবাবু চায় না, এখনি চায়না। হয়তো একদিন বলবে, নেতায় নেতায় সমঝোতা করো। সে গোপন থাকুক। মরতে লেবার মরুক।

সে সময় বোধহয় এখনো নয়, এখনো নয়।

এখন তপন, ভবানীবাবুর নকশায় কি ভূমিকায় থাকবে?

—কি ভাবচ তপন?

— ও কিছু নয়।

— ভাবনাচিন্তা তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও তো। কাজের ছেলে, কাজ করে যাও।

— দীনুবাবুও তাই করেছিল।

— এ হে হে, তার কথা ভাবে কেউ? তার চরিত্তের ওপর কণ্টোলই ছিল না। থাগলে ব্যারাকে যেত? অমন বউ ঘরে? আমার মত বেম্মোচারী পাবে কোথা? বউ মরল, বে' করলাম না।

— আপনার তুলনা আপনিই ভবানীদা!

— তবে ভাবনা কিসের?

—আমি কি করব?

— নকশাটা বুজে নাও। টাইগার! চুল্লুর ঠেক একন ক'টা চলচে?

— ষোলটা।

—হরিজন বস্তি থেকে কেমন ওটে?

— ভাল।

—ওখেন থেকে দুটো তুলে দাও। ষোলটা কমিয়ে দশে আনো। ওই যে ছ'টা কমল, লোকে তাই দেকবে তপন, বাকি দশটা মেনে নেবে। হ্যাঁ, ওগুলো যখন তুলে দেবে, তখন অবিশ্যি দলবল নে' যাবে। মাইকে বলবে, ভরত বাশফোরের সপন ছিল, হরিজন পাড়ায় চুল্লু চলবে না, সে সপন আমরা সফল করচি। এ ভাবে ধীরে ধীরে, অন্যগুলোও তুলে দেব। পুলিশ নে' যাবে। জুয়ার ব্যাপারটাও তাই। আসলে ভরত নেই। হরিজন পাড়ার ছেলেদের মদে জুয়ায় ঢুকিয়ে নাও। ওরা মজা পেয়ে যাবে। এলেবেলে হয়ে যাবে সব। আমাদের ছেলেরা অকম্মক হয়ে যাবে, এটা কোনো কাজের কতা নয়। কাজ দিতে পারি না, বেকার করে দেব? ছেলেই বা কোতা তেমন? দেক, কাকে পাও! আর রইল ব্যারাকবাড়ি। ওটা টাইগারই দেকুক।

ওটাও থাকবে?

ভবানীবাবু ঝুঁকে বসল।

কি বলচ তপন? আট-দশটা মেয়ে যাবে কোতা? তাদের

বের করে দিলে মানুষ ছিঁড়ে খাবে না ? তারাই বা খাবে কি ? অবলা জাতি, যাবে কোতা ? এটা ধম্ম হয় না।

আট-দশজন নয় ভবানীদা···জনা তিরিশ।

—ওই হলো। এখেনে ওরা এট্টা পোটেকশানেও আচে। দেকেচ বোধহয়, এট্টা সেলাই ইস্কুলও করে দেওয়া হয়েচে, যাতে কাজকম্ম শিকে সুপতে যায়। চেষ্টা করিচি। কিন্তু সুপতে হাঁটার মাল নয় কেউ। সব রস পেয়ে গেচে। দেকেচ ইস্কুলটা ?

আমি জানি না। কখনো ঢুকিনি।

—তা ছাড়া নিচে কিচু দোকানপাট···

হ্যাঁ, মদের দোকান···

—নীতিবাগীশ হয়ে তো লাব নেই তপন ! বলতে পার যে ব্যাপারটাই খারাপ। কিন্তু তুমি আমি মন্দ বললেই ব্যাপারটা মন্দ হচে না। দেশ জুড়ে, জগৎ জুড়ে চলচে। তা ছাড়া, সিদে কতা, যাদেরে আমি ভস্সা দিয়ে যুববাহিনীতে এনেচি, তাদেরে হটাৎ পাতে ভাসিয়ে দেব না। ওদেরকে রাকতে হবে। তুমি বুজচ না, এগদিন ওরা কাজে দেবে।

ওটা তো টাইগারই দেখবে।

দেখবে বই কি। তুমি চেপে বসে থাকো। সব্যাদিকে নজর রেকো। বম্বা আচে, থানু আচে, রঙিন আচে, মলয় আচে। তবে ওদের ওপর হামলা এলে তুমি দেকবে। তুমি যে কী করবে ! এট্টা ফ্রন্ট্ তোমার দরকার।

—ফ্রন্ট তো দরকারই।

কিন্তু কিছুই বিশ্বাসযোগ্য হবে কি ? তপনকে তো টাউন চিনে গেছে। থানার দারোগা যাকে বসিয়ে চা খাওয়ায়, "তপনবাবু" বলে, সে লোককে কেউ বিশ্বাস করে ? টাউনের বুকে তিনটে খুন করেছে যে, তাকেই থানা খাতির করছে। তপন দোকানী হোক, ব্যবসায়ী হোক, সবাই জানবে ওটা ফ্রন্ট। আসলে তপন ভাড়াটে খুনী, মার্ডারার।

কিছু ভেবেছ ?

আমার তো কোনো বিষয়েই তেমন···

কনট্রাক্টারি করো।

—কিসের ?

—জমি…বাড়ি…ল্যান ডেভলাপমেন্ !

—কোথায় ?

—আমার বাড়িটা বড্ড ভেতরে পড়ে যায়। মোহনলালের সঙ্গে দীনুর বাড়ির আউট হাউসে…

—আমার ক্যাপিটাল কোথায় ?

—মোহনলালের দশ, তোমার ছয়। ক্যাপিটাল ইন্‌ভেস্ট আমি করব। তার সঙ্গে থাগবে শংকুবাবু। জমিজমা বোজে কোর্টে হ্যাঁচড়-প্যাঁচড় করে বেরিয়ে আসতে মাস্টার লোক আর মলয়, থানু, রবি সঙ্গে থাকুক। ওদের সঙ্গে বকরায় কা কোর। ধরো জমির ব্যাপারে পফিট হাই, ওদের দিয়ে-থুয়ে খেও আমার এট্টা কাট, সে আর আমি নেব না। কেননা জমি ডেভেল করে বাড়ি তুলব তো আমি।

—মোহনলালবাবু তো

—কংরেস ? তাতে কি ? ভেতরে সমজোতা রাকতে হবে না কে জানে আবার ওরা ক্ষমতায় ফিরবে কিনা ? এটাও তো ভুলে চলবে না যে মোহনের ভাই নন্দলাল মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান

—এ ব্যবসা চলবে ?

ভবানীবাবু ভগবান হয়ে গেল। ভবিষ্যৎবাণী করল। পরে আট বছরেই ওর কথা সত্যি বলে প্রমাণ হয়ে যাবে।

—এই এগটা কারবারই চলবে। মানুষকে থাগতে হবে তো এ সময়ে তোমাদের কোম্পানিকে দিয়ে দশ লাখ টাকার পপা কেনাব, দশ বচরে তার দাম হবে কোটি টাকা। কলকাতা মানুষকে ধরে রাখতে পারবে না। উগরে ফেলবে। মানুষ সর্বত্তর পপা খুঁজবে। একনো বোজা যাচে না, কিন্তু গোটা গোটা বাড়ি নিয়ে বাস করার দিন চলে যাবে। সবাই ফ্ল্যাট কিনবে। বোম্বেতে দেখে এসেচি।

—আমারও কিছু কথা আছে।

—বলো না। ঝেড়ে কাশো।

—আমি আলাদা থাকার জায়গা চাই।

—একন আউট-হাউসে থাকো। দেখবে তিন বচরে নিজে বাড়ি

রে নিওচো।

—ব্যারাকবাড়ি সংক্রান্ত কোনো ব্যাপারে আমি থাকব না।

—সব সময়ে থাগতে হবে না, কিন্তু ওটা হলো নিরাপদ ায়গা। কখনো যদি তোমাকেও ওই টাউনে শেলটার নিতে হয়, র মতো জায়গা পাবে কোতা? আর তপন! বয়স কম, রক্ত গরম, টা কতা ভাব! অ্যাকশান করোচো

—অ্যাকশান? আমি?

—ও! তুমি ধরে রেকোচো যে নকশালদের কাজগুলোই ্যাকশান? এ ঠিক নয়। তোমাদের কাজও অ্যাকশান।

—না! চম্পক আর আমি এক? চম্পক কখনো খুন করেনি, ই খুন হল।

—আর তুমি খুন করোচো, কিন্তু তোমার গায়ে কেউ হাত বে না এখন।

—যাক গে, বলুন।

—জানি, জানি, সিমপ্যাতি আচে। নইলে বোনকে শ্যামলের ঙ্গে বে' দাও? তা থাকুক। যা বলছিলাম, যা করোচো, আমার ায় করোচো। একন তুমি বস্। টাউনে আমাদের ছেলেদের াটেকশান দেবে। সবাই যে-যার কারবারের টাকা থেকে যেন নার ভাগটা দেয় তা দেকবে। অযতা মারদাঙ্গা না হয় তা কবে

—কেমন করে? আমাকে ফ্রি হ্যান্ড দেবেন?

—কেমন ধারা? আমি বাবু হাই এডুকেশনে যাইনি। অবশ্য যোগ ছিল। কিন্তু অসুবিদে হয়নি কিচু। তবে সাদা কতা জি, প্যাঁচ কতা বুজি না।

আমি সোজা কথাই বলছি। কয়েকটা ব্যাপার বন্ধ করতে বে। এই দোকান বাজারে পয়সা না দিয়ে জিনিস তুলে নেওয়া, ালা নেওয়া, প্যাডলারদের হ্যারাস করা, পথেঘাটে মেয়েদের নিয়ে নাটানি···এতে পাবলিক শত্রু হয়ে যায়। এগুলো তো খুব ড়েছিল।

—এ খুব ভাল কতা তপন। এ হলো পলিটিস বোজা ছেলের তা। আমি তোমাকে ফ্রি হ্যান্ড দিলাম। বিশেষ, মেয়েছেলের

অপমান। না। এ সব বন্দ কত্তে হবে। বন্দ করলে আমারই সুনাম। সুধীনবাবুও বুজবে যে আমরা এট্টা নতুন ঢঙে চলতে চাইচি।

—ওদের যে অব্যেস হয়ে গেছে?

—অব্যেস্ ভেঙে দাও। নিজেও ঠিক থেকো। দীনু এককালে বলিছিল, টাউন থেকে লাইন তুলে দেব। মদ ছোঁব না, ছুঁতে দোব না। রাকতে পারল?

—আমরা ওঁকে বরাবর মদ খেতেই দেখেছি।

—তোমরা তো সেদিনের ছেলে। দীনুর মাকেও দেকনি। তেজী মানুষ ছিল। ছোট ছেলের ওপর অধিক টান ছিল। এখানে থাগত। দীনু কুপতে যেতে দীনুর বউ শাশুড়ীকে খুব মুক কত্ত। তুমি আদর দে' ওর মাতা খেওচো। বলতে সে পারে। কম বড় ঘরের মেয়ে তো নয়? বে'তে বাপ সোনার মটুক দিইছিল। তা বলে-কয়ে ছেলেকে ফেরাতে পারল না তো "কুপুত্তুরের মুক দেকব না" বলে বড় ছেলের কাচে চলে গেল। বড় ছেলে তো আগেই যেয়ে সোদপুরে বাড়ি করেচিল। ওকালতিতে পশার খুব। মস্ত বাড়ি। তবে বড় বউ শাশুড়ীকে মুক করেচে খুব। বুড়ী জ্বলে-পুড়ে মরেচে।

ভবানীবাবু অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

—দীনুর কি কম গরম ছিল? বোম বাঁদতে বাঁদতে হাত উড়ে গেল। তা বড় বড় নেতারা যেয়ে দেকেচে। সেই লোক দেক, মত্তে কেউ এল না।

এমনভাবে কথা বলে ভবানীবাবু, যেন দীনুবাবুর মৃত্যু ঘটেছে স্বাভাবিকভাবে। যেন তপন তাকে মারেনি। তপনের চোখ লালচে হয়ে ওঠে। ভবানীবাবু কি তাকে খোঁচা দিয়ে দেখছে?

—সিগারেট খাবে? খাও না।

—না। কমই খাই।

—যা হোক, তুমি খুব ফেতফুল কাজ করোচো। আমিও নেমোখারাম নই। টাকা তোমার হবে। যদি বলো, তোমার ভাইদেরও এনে নিতে পার।

তপনের মন বলে, ওদের নাম করবেন না। ওরা সরে গেছে,

নিরাপদে থাকুক।

এ কথা জোরে বললে ভবানীবাবু জেনে যাবে খুব ইদানীং তপনের ভাইবোনদের বিষয়ে উৎকণ্ঠা জন্মেছে।

ও বলে, নাঃ! ওদের সঙ্গে আমার সম্পর্কই বা কি? আমি কবে থেকে ঘরবাড়ি ছাড়া।

-সে তো জানি। তবে তোমার মা যায় আসে।

-আমি সে জন্যেই বাড়ি ছাড়তে চাই।

—বে' করবে বলে ভাবচ?

—কে, আমি?

তপন ঈষৎ হাসে ও মাথা নাড়ে।

—গুমরো মেরে যাচ্চ তপন। বে' করা তো ভাল। এট্টা আপনজন থাকা ভাল। এমন একা একা...

একা কোথায়? তপন আট বছর আগে যা ছিল তা তো এখন নেই। এখন সে আরেক তপন হয়ে গেছে। আর, রেবার বিয়ে তাকে প্রথম ভাবাতে শুরু করেছে মা, রেবা, সুকু, বুকু সম্পর্কে। বারবার মনে হচ্ছে, তপনের ছায়া যেন ওদের জীবনে না পড়ে।

—লাফাঙ্গাগুলোকে টাউন-ছাড়া করো। ওই সবুজটা

—সবুজ কোনো থেট নয় ভবানীদা।

—ওই দাদারই ভাই তো?

—দেখব।

কি দেখবে তপন? সবুজ ছোট বেলা থেকে লাফাঙ্গা। স্কুল পালাত, বাড়ি থেকে চুরি করত। শ্যামলের ভাই বলে মনেই হয় না। সবুজকে কি জন্যে তাড়াবে তপন? তপন বুঝল, ভবানীবাবু চায়, সবুজের মতো দুর্বল যারা, তাদের ওপর শোধ তুলে সুনাম কিনতে।

—শ্যামল কোতা আচে জান?

—জানি না। জানতেও চাই না।

—কড়া হাতে রাশ না রাকলে নকশালরা আবার উঠবে। ও বড় ভয়ানক রোগ।

তপনের মনে হলো আসুক তারা, আসুক। সন্ত্রাসে কাঁপিয়ে দিক ভবানীবাবুদের।

—লাইন যা দিলাম, বুঝে চললে করে খাবে। টাকা একন মাটিতে, জানলে ? আর তোমাকে এট্টু হাসিখুশি থাগতে হবে।

—হ্যাঁ।

—এত ভাবনার কি আচে ? তোমার বয়সে আমি···

—দেখব।

—তোমার নামে অ্যাকাউন্ট আচে ?

না।

—অ্যাকাউন্টে বা লাব কি ! বিজনেস ম্যানেজম্যানের ভার তুমি মোহনবাবুকে ছেড়ে দিও। কোম্পানি জয়েন নামে রেজিস্ট্রি হবে। একনকার মতো অ্যাকাউন্ট খুলে নিও। পরে দেকবে ঘরে লোহার সেপে টাকা রাকা অনেক ভাল।

তপন ঈষৎ হাসে।

--শিখে যাব। টাকা ছিল না, জানতাম না, টাকা হলে টাকা রাখতেও শিখব। কিন্তু একটা কথা বলবেন ?

—কি ?

—ভরত, দীনুবাবু, ইরানী এদের খুনের ব্যাপারে পুলিশ কোনো অ্যাকশান নিচ্ছে না কেন ?

ভবানীবাবুর চোখ অন্যরকম হয়ে যায়।

—খুনীদের ধরা যায়নি। তারা পলাতক। কেস ওপেন আচে। ধরতেই পারে, বলতেই পারে এদ্দিন খুঁজে পাইনি। তুমি ঠিকমত চললে কেস চাপাই থাগবে। দীনুর ব্যাপারে ওর বউ চেষ্টা কত্তে পারত। মোহনলাল ভস্‌সা দেয়নি, ছেলেটা আচে, ভয় খেয়ে গেল। ইরানীর জন্যে কে ভাববে ?

—তাও বটে !

—উলটোপালটা ভেবো না। কাগজে একনি কিছু লিখবে না কেউ। পরে কি হবে, কে জানে।

তপন নিশ্বাস ফেলে।

—না, উলটোপালটা ভাববই বা কেন ?

—আমি ভাবব, তুমি কাজ করো। একন বসো। আমি চান করে আসি। খেয়ে-দেয়ে রওনা হয়ে যেও। বাতরুমে যাবে তো, বারান্দার ডানদিকেই পাবে।

ভবানীবাবু বেরিয়ে যায়। এতক্ষণে টাইগার নড়ে বসল। আশ্চর্য, কথাও বলেনি, নড়েওনি।

টাইগার বলল, তোমাকে এত বললাম, সাবধানে কথা বলবে। তুমি শুনলে না।

- হয়ে যাবে টাইগার, সব শিখে যাব।

— ব্যারাকবাড়িকে তোমার খুব ঘেন্না ?

—আমি কিছু কাজ পারি, কিছু কাজ পারি না।

—আমার পক্ষে ভালই।

তুমি তো চেয়েওছিলে।

- বিজনেস ইজ বিজনেস, বস্। তুমি অবশ্য আসল জায়গায় পৌঁছে গেলে। আমার কথা শোনো তো চেম্বারও রাখবে। ফেরার পথে কথা বলব।

তপন বাথরুমে যায়। মুখেচোখে জল দেয়। নিজেকে মনে হচ্ছে ফাঁদে ধৃত জন্তু। কবে থেকে ভবানীবাবু তাকে খরিদ করে নিয়েছে, কবে থেকে ?

কোনদিন তার শৈশব ছিল ? ভরতের বাবা ধানুর তৈরি ঘুড়ি ওড়াত ও মাঠে ? ক্লাবের দুর্গাপুজোয় ভলান্টিয়ার হতো ? চম্পক, শ্যামল আর সৌরভের সঙ্গে ক্লাবের ফাংশানে কোরাসে "পঞ্চনদীর তীরে" আবৃত্তি করেছিল ? সে অন্য কারো জীবনে ঘটেছিল।

বাথরুমের জানলা দিয়ে দেখা যায় সার সার বাড়ি, বাড়ির জঙ্গল। কলকাতা একটা জঙ্গল এর মধ্যে কোথায় আছে শ্যামল আর রেবা ?

জানতে চায় না তপন, জানতে চায় না।

ওরা ভাল থাক।

বেশ করেছে শ্যামল। তপন নামে যখন সন্ত্রাস, তখন সে নামের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ থাকতে দেবে কেন ? তপন যা যা করেছে, তা যদি শ্যামল করত, শ্যামলের বোনকে বিয়ে করতে হলে শ্যামল যা বলেছে তপনও তাই বলত।

তপন বেরিয়ে আসে।

টাইগার বলে, বসো, ডাকবে।

তপন কাগজ উলটোতে থাকে। বাংলা কাগজ, সিনেমার কাগজ,

একটি টেলিফোন ডিরেক্টরি।

টাইগার বলে, ফোন আছে, বইয়ে নাম নেই। রেণু বউদির নামেও আছে, সেটা বইয়ে আছে। বাড়িটা দেখেছ? আগাগোড়া জয়পুরী মার্বেল। দরজা, জানলা বাড়ি হতে হয় এ রকম! ওপরে জাঁকজমক আরো বেশি।

খাওয়ার জন্যে পাশের ঘরে যেতে হয়। শ্বেত-পাথরের টেবিল, ঝকঝকে কাঁসার থালার চারদিকে বাটি।

— কিছু নয় আয়োজন, আমার ঠাকুরের অন্নভোগ।

· আপনি খাবেন না?

—আমার দেরি হয়।

ভবানীবাবু বলে, সব্যদা চান কচ্চে তো! চান করবে চারবার। তারপর এটা খায় না, ওটা খায় না।

—কি করব বলো ভাই? জন্মগত মোটার ধাত। একন লোব করলে কি বাঁচব?

পোলাও, সাদা ভাত, লুচি, মুগের ডাল, পাঁচরকম ভাজা, মোচার চপ, ছানার ডানলা, আলুর দম, চাটনি, ক্ষীর, বড় বড় মিষ্টি।

মহিলা সহৃদয় গলায় বলেন, সব খাঁটি তেল-ঘিয়ে রান্না। নির্ভয়ে খাও।

ভবানীবাবু ঘাউ ঘাউ করে সব খেয়ে নেয়। বলে, মাচ মাংস না হলে ঠিক···দুখানা চপ দেখি?

—সব আমি রেঁদেচি। জানতাম না কিছুই। তারপর রান্নার বই দেকে দেকে···

খাওয়া হয়ে গেলে ওরা আবার বসার ঘরে আসে। ভবানীবাবু সেফ খুলে একটি বড় খাম তপনকে দেয়।

—পুরো দশই আচে। এ তুমি ব্যাঙ্কে রেকো।

ফেরার সময়ে টাইগার বলে, শ্যামলের নাম বলে তোমায় বাজিয়ে দেখছিল। ওকে কতদিন দেখছি, সব বুঝি।

—শ্যামলের কথা আমি কি জানি?

—জান না। ও বিশ্বাস পায় না। তোমার বোন বসু, খুব ভাল মেয়ে। পথেঘাটে দেখেছি তো।

— আলাপ হয়েছিল?

—বাপ্‌রে! তোমার বোনের সঙ্গে কথা বলব আমি? ওরা গেলই বা কোথায়?

—জানি না। আর টাইগার, আমার বাড়ি বা পরিবার নিয়ে কোনো কথা আমি শুনতে চাই না। আমার সঙ্গে তাদের যোগাযোগ কিছু নেই। এক বাড়িতে আছি, থাকব না।

—তোমার তো বাড়িও হবে।

—কি জানি। আচ্ছা তুমিও তো টাকা কম পাও না, বাড়ি-টাড়ি কর না কেন? এত মদই বা খাও কেন?

টাইগার ঘাড় ঝাঁকাল, এক হাতের তালু চিত করল। এগুলো নৈরাশ্যের অভিব্যক্তি।

–টাকা, ধরো খানিক ইনভেস্‌মেন্টে রেখেছি, বাকিটা উড়িয়ে দিই। বাড়ি! বাড়ি বাবা করেছে, বাবা-মা থাকে। বোনের বে' হলে জামাইও থাকবে। তিন ভাই তো লাইনে। বাবা-মা বোঝে, সব বোঝে। বলে ছেলেরা বিজনেস করছে।

—বাবা কিছু করেন?

—পোকামারা ওষুধের ডীলার। একেক সময়ে মনে করি বে' করি, বাড়ি করি, সেটেল করি। কিন্তু সে আর হবে না। লাইনে এলে লাইফে সব টেম্পোরারি। পার্মানেন্ট কিছু হবার নয়। এখন ইচ্ছে আছে একটা হেভি ট্রাক কিনব। মাল বইব কলকাতা থেকে পাঞ্জাব। পাঞ্জাব থেকে মধ্যপ্রদেশ। ভাল বিজনেস। আমার চল্লিশ বছরে ফাঁড়াও আছে হাতে।

– সে তো ভাল।

—টাকা হলে তবে তো? ভবানীদা দেখ, কেমন গুছিয়ে চালাচ্ছে। বউ মরে গেল, ও তো বেঁচে গেল। এই যাঁকে দেখলে, ইনি অনেকদিনের। তবে পার্মানেন্ট হয়ে গেছে। ইনিও বলে, "ঠাকুরপো", আর মেয়ে দুটো জানে যে বাপ হয়, তবু "কাকা", "কাকা" বলে কি আদিখ্যেতা করে! ভবানীদা দেখো, বিছানায় শুয়েই মরবে।

তপন হাসে।

– আমরা?

- মায়ের ভোগে যাব। সন্দেহ আছে কিছু? আমাদের মধ্যেই

তো গ্যাংওয়ার লেগে যাবে বস্‌। দীনুবাবুকে তুমি হড়কে দিলে, তাতেই তুমি বস্‌ হয়েছ। যাক্‌ গে, ভবানীদা যা বলবে তেমন চলাই ভাল। তীর্থরা তো কাউকেই বিশ্বাস করে না। চলছে, চলুক। পাল্টি তো খাবেই।

—দেখা যাক। তীর্থ জেদী ছেলে, কাজের ছেলেও বটে।

—পুলিশের কাছে শুধু তুমি নয়, তুমি, আমি, মলয়, সকলের খাতা খোলা আছে। ভবানীদার যেদিন দরকার পড়বে, সেদিনই ধরিয়ে দেবে।

—দেখা যাক।

—অমন মুখের ওপর এ-চাই, ও-চাই না বললে। তোমার বোধহয় জানের ওপর খুব মায়া নেই।

—মায়া থাকলেই কি আমার জান আমার হাতে?

—তুমি পপুলার হয়ে যাবে বস্‌। টাউনে মস্তানি আর তোলা ওঠানো বন্ধ করলে···

ওটা কিন্তু খুব জরুরি টাইগার। ভবানীবাবুর জন্যে নয়, আমাদের জন্যে। পুরো টাউনকে খচিয়ে রাখা কৌশলগত ভুল। আমরা তো জানি না যে কবে আমাদের শেলটার দরকার হবে। মানুষ ভাল বলে, এমন কাজ কিছু করা দরকার।

—হয়তো সত্যি। কিন্তু অব্যেস হয়ে গেছে···

—আমি অব্যেস ছাড়াতে পারব। তবে তুমিও, টাউনের আশপাশ থেকে মেয়ে তুলো না।

—যে-যার লাইনে, যেমন পারে করবে। তবে মেয়ে কি তুলতে হয়? ওরা এসে যায়।

কথাটা মনে রেখো।

—কতাবার্তা বসের মতো হয়ে যাচ্ছে।

অথচ তপন বস্‌ হতে চায়নি। আর বস্‌ হতে হলে যা যা করতে হয়, তাই করে চলেছে।

## ॥ তিন ॥

বস্ হয়ে গেল তপন।

মাকে টাকা দিয়ে বলল, ছেলে দোকান বাড়াবে, কি করবে, এতে কিছু হবে ?

—কিছু কেন, অনেক হবে।

হবারই কথা। তখনো টাকার কিছু দাম আছে। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে বেশ একটা জাগরণ। টাকাটা হাতে দিতে মাকে খুশি-খুশিই দেখাল। মা কি বোঝেনি এ টাকা কেন আসছে ?

না, তপনের অবস্থা দস্যু রত্নাকরের মতো। যাকে পরিবারের সকলে বলেছিল, তোমার কর্তব্য আমাদের প্রতিপালন করা। তা তুমি কেমন করে করবে, সে আমরা জানতে চাই না।

-সুকু টাকা নেবে তো ?

—নেবে। কে দিচ্ছে ওকে ?

দোকান দাঁড় করাক। বিয়ে করবে বলেছিল, বিয়ে করুক। কিছুই তো করতে পারিনি ওদের জন্যে। তবু যদি দাঁড়াতে পারে, সেই তো ভাল।

মা নিশ্বাস ফেলল।

হ্যাঁ, ওরা গরিবভাবে চলতে জানে। মেয়েটাও ভাল, মানে ঘরোয়া। শান্তিতে থাকুক। স্বামী-স্ত্রী যদি বুঝে চলতে পারে, তাতেই শান্তি হয়।

ছোট দোকান, ছোট ঘর। একটি কেরোসিন স্টোভ, রান্নাবান্নার সামান্য সরঞ্জাম। কি অসম্ভব ক্ষমতা সুকুর ! ওটুকু, আর একটি ঘরোয়া শান্ত মেয়েকে বল পেয়েই ও সুখী হতে পারবে।

খুব সাধারণ জীবন, সরলরেখার জীবন। ভরতের বোন চামেলির ঘর যেমন। ঝকঝকে পরিষ্কার, ইট দিয়ে উঁচু করা তক্তাপোশের নিচে বাসন-কোসন। চামেলি রোগা, ছোটখাটো মানুষ। কিন্তু কি তৃপ্ত ওর স্বামী আর সন্তানদের নিয়ে !

এখন আর তৃপ্ত নয় নিশ্চয়। ওই ছোট, গরিব ঘরে-দোরে ভরতের রক্তের দাগ লেগে গেছে। তপন ওদের সুখশান্তি কেড়ে

নিয়েছে।

ভরতও বোধহয় ওর চেয়ে বেশি সুখ চায়নি। রেবা আর শ্যামলও তো চায়নি। সংসারে এ সব সামান্য উপকরণে কত শান্তিতে থাকা যায়, তপন আগে বোঝেনি।

হাসপাতালে ডিউটি করে কোনো পেশেন্টের বাড়ি থেকে টাকার সঙ্গে একটা কাপড় দিলে মা খুশি হতো। দেখে তপনের বুক রাগে জ্বলে যেত। বাবা একদিন মদ না খেয়ে ফিরলে মা খুশি হতো। ভাতের পাতে একদিন মাছ পড়লে সুকু আর বুকুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠত।

তপন সে সবের দাম বোঝেনি। এখন বুঝেও তো ফেরার পথ নেই। তপন কি জীবন থেকে আগের দাগগুলো মুছে ফেলতে পারবে?

মা বলল, রেবারা ভাল আছে। ওরা দুজনে কলকাতায়…

তপন যেন ভয় পেল।

বলোনা মা, কোথায় আছে বলো না। টাউনে ওদের নাম ও বলো না। তুমি জান না মা, শ্যামলের ওপর ভবানীদার ভয়ংকর রাগ। আমাকে বলো না। আমি জানতে চাই না। শুধু বলো, ওরা ভাল আছে।

মা চুপ করে গেল।

আমিও বাড়িতে থাকব না মা।

- কোথায় যাবি?

- টাউনেই। অন্যত্র।

বাড়িতে থাকলে কি…?

—থাকা ঠিক হবে না। আমি, আমি আসব, তোমায় দেখব। তুমি চিন্তা কোর না। টাকা তো করছি। তুমি চোখটা দেখাও, চশমা করাও। এবার ব্যাঙ্কে একটা খাতা খুলে নাও। বাড়িতে টাকা রাখা নিরাপদ নয়।

—তোর বিপদ, তপন?

তপন মার দিকে চাইল। তপনের এখনি কোনো বিপদ দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু "তপন" নামটি তো সন্ত্রাস হয়ে উঠবে আরো, বিপদ মা-বাবার। কেমন করে এ জটিল অংক মাকে বোঝানো

যাবে ? মা বুঝবে না।

—না মা, কোনো বিপদ নেই। কিন্তু সবাই জানে বাড়ির সঙ্গে আমার মন থেকে কোনো সম্পর্ক নেই। তাই জানাই ভাল। আমার কোনো কাজের সঙ্গে বাড়ির লোকজনকে জড়াবে না কেউ।

তুই···কোথাও চলে যেতে পারিস না ?

—নিজের কাছ থেকে কোথায় পালাব ? আমার কথা আর ভেব না।

—বললেই কি ভাবনা যায় ?

তপনের কাছে কথাগুলো খুব দুর্বোধ্য। তপন ওর মার নাগাল পাচ্ছে না কেন ? তপনের বলতে ইচ্ছা হলো, আমি কবে তোমার কথা ভেবেছি যে আজ তুমি আমার কথা ভাববে ?

তপন বলল, যা ভেবে লাভ নেই, তা ভেবে কি করবে মা ? শোন, তুমি দেখ, কোনো কাজের লোক পাও কিনা। এখন তো আর সব কাজ করার দরকার নেই।

—তাই দেখব।

সুকুকে বলো। যেমন পাব তেমন দেব, আবার দেব। বুকুকেও দেব।

তপনের "বস্" হবার ব্যাপারটি টাউন খুব লক্ষ্য করছিল। সুধীনবাবুর জায়গায় লালটুবাবুই স্থানীয় রাজনীতিক নেতা। বড় নেতাকে সব সময়ে পাওয়া যাবে না, লোকাল নেতা হলেন ওপর মহল ও নিচের তলার যোগাযোগের জংশন স্টেশন।

তাঁর বাড়িতেই অফিস। অন্তত তখন। দশ বছরে নতুন অফিস-বাড়ি উঠেছে এখন। তখন তাঁর বাড়িতেই প্রথম হলো আন-অফিসিয়াল মিটিং।

তরুণদের মধ্যে তীর্থ, অভীক, বাবুল, সোমজিৎ এরাই নেতা।

তীর্থ বয়সে কিছু বড়। চম্পক, তপন, শ্যামলেরই সহপাঠী ছিল। তীর্থ ধীরস্থির, ভেবে কথা বলে। সাধারণ কথাও একটু থেমে, ভেবে ভারি গলায় বলে। অভীকের মতে নেতা হবার সব লক্ষণই তীর্থের মধ্যে আছে।

বাবুল মোটামুটি কর্মী ছেলে। নিজে উদ্যোগ নেবে না, কিন্তু যে কাজ বলা হোক, প্রাণ দিয়ে করবে।

সোমজিৎ হলো আনন্দময়, মিষ্টি স্বভাবের। ভাবুক ছেলে। সংস্কৃতি ক্ষেত্রেই ওর আগ্রহ বেশি। চমৎকার মাউথ অর্গান বাজায়।

তীর্থ বলল, লালটুদা, টাউনকে কিছুতে সমাজবিরোধীমুক্ত করা যাবে না? দীনুবাবু গেল, তো তপন এল।

অভীক খুব সোজাসুজি কথা বলতে অভ্যস্ত। ও বলল, দীনু-বাবুকে তুলেছিল তো ভবানীবাবু।

লালটুবাবু বলল, কি বলতে চাইছ?

—ভবানীবাবু এখন সুধীনদার নির্বাচনে সাহায্য করল, এটা কি রকম? আমারই বা সে সাহায্য নিলাম কেন?

—মানুষ বদলেও তো যায়। ভবানী তার ভুল বুঝেছে।

—মোহনলালের সঙ্গে ব্যবসায় নামছে।

—রাজনীতিগতভাবে বিরোধিতা করো। নিজেদের সংগঠন বাড়াও, শক্তি বাড়াও। এ রাজ্যে অধিকাংশ শিল্পপতিই তো কংরেসকে ভোট দিত। সকলকে আমরা শত্রু বলে বাদ দিলে রাজ্যের অর্থনীতিক উন্নয়ন হবে?

— তা বলে খুনে গুন্ডাদের নিয়ে চালাতে হবে?

—সমাজবিরোধী নিয়ে চলতে হবে এ আমি প্রাণ থাকতে বলব না। কিন্তু তোমরা গুন্ডা নও। এ মুহূর্তে ওদের সঙ্গে বিরোধে নামলে টাউনে আবার বোমাবাজি শুরু হবে।

—পুলিশকে অ্যাকশান নিতে বাধ্য করুন।

সোমজিৎ হাত তুলল।

—ধীরে, বন্ধু, ধীরে। রাতারাতি কিছু পালটে যাবে না। পুলিশ টাকা খায়, দুর্নীতিবাজ ও সমাজবিরোধী, রাজনীতিক নেতা—এদের কথায় চলে। "অ্যাকশান নাও" বললেই সে নেবে? চম্পকদা'র বেলা নেয়নি, ভরতের বেলা নেয়নি। চম্পকদা'র বেলা আমরা বলিওনি।

— চম্পকের কথা কেন?

—জেল থেকে বেরিয়ে সে তো নকশালী করছিল না। আমাদের দাবী করা উচিত ছিল। ভরতের বেলা করেছি।

- চম্পককে মেরেছিল কে মনে করো?

তীর্থ বলল, আমরা অন্য প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছি। চম্পককে খুন

করায় দীনুবাবু, মানে মলয়কে দিয়ে।

অভীক বলে, সে তো ভবানীবাবুর ফ্রন্ট।

— আর ভরত, দীনুবাবুকে খুন করল তপন।

- সেও ভবানীবাবুর ফ্রন্ট।

লালটুবাবু বলে, আরেকটা কথা অভীক, খুনের ব্যাপারে সাক্ষী-সাবুদ, প্রমাণ হওয়া, মানে পুলিশ ধরার পর—তারপর কাউকে খুনী বলা যায়। এ সব কথা বেশি বলা ঠিক নয়। মানে টাইম এখনো রাইপ নয়।

তীর্থ বলল, আমরা সতর্ক থাকব। দেখব। সমাজবিরোধী কাজকর্ম বাড়লে ব্যাপক আন্দোলন করব।

অভীক বলল, পথে এসো। নাথিং লাইক গণধোলাই।

সোমজিৎ বলল, আমি কি তপনের সঙ্গে কথা বলব ?

না।

লালটুবাবু গর্জে উঠল ?

—তপন কি সে তপন আছে !

—ওর ক্ষমতা ছিল। অবশ্য ছিল বলেই ভবানীবাবু রেক্রুট করেছিল। সেই ভবানীবাবু আমাদের সমর্থক এটাই নীতিগতভাবে মানতে পারছি না। আমি যাচ্ছি আমার কাজ আছে। নন্দিতা গান শিখে বেরোবে। বাজারের রাস্তাটা জঘন্য।

বাবুল বলল, তাহলে বসে ক্যালাচ্ছ কেন ?

আমি যাই লালটুদা, তীর্থদা।

ও বেরিয়ে যেতে অভীক বলল, চল্ আমরাও যাই। জায়গাটা ভাল নয়। কয়েকটা মেয়েই তো ফিরবে।

সোমজিৎ দূর থেকেই একটা তর্জন গর্জন শুনছিল। তারপর দেখে একটা ভিড়। "নন্দিতা !" বলে ও এগিয়ে যায়।

তপন যেন কাকে ধরেছে। মারছে। ওর চাপা ক্রুদ্ধ গর্জন শোনা যায়। আর মারলে তুমি মরে যাবে রঙিন, তাই ছেড়ে দিচ্ছি।

তারপর হেঁকে বলে, টাউনে স্টেশন থেকে ফিরতে, বাজারে, বাসস্ট্যাণ্ডে মেয়েদের আওয়াজ দেবে, পিছু নেবে, অপমান করবে, সে জমানা চলে গেছে। আমি থাকতে এসব সহ্য করব না। অন্যদেরও বলে দিও। আপনারা চলে যান। নির্ভয়ে চলে যান।

একদিন কেউ কোনোভাবে কোনো মেয়েছেলেকে অপমান করেছ কি, আমি তাকে দেখে নেব।

সমবেত জনতা চুপ।

—যান, চলে যান আপনারা। আপনাদের টাউন, আপনারা নির্ভয়ে পথ চলবেন। টাউনে মেয়েদের মানইজ্জত নিয়ে চলা খুব অনিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল তো? টাউনের সে চেহারা আমি পালটে দেব।

রঙিনের ঠোঁট ও নাক থেঁতলে গেছে। পুলিশের গাড়ি থামে। নার্ভাস ও. সি.।

—কি হলো তপনবাবু?

—যা হচ্ছিল, ইভটিজিং। আর হবে না। রঙিনকে হাসপাতালে নিয়ে যাও কেউ।

কে যেন বলল, ওই মার মারে?

—কিছুই মারিনি। আমি তপন। আমি যদি মারতাম, ও বাঁচত? ও সব এতদিন করেছে রঙিন, এখন তুমি কেন, ইভটিজিং দেখলেই শাস্তি।

ও. সি. বলে, ধরব?

—ধরবেন।

—তারপর?

—আধখানা মাথা কামিয়ে ছেড়ে দেবেন। নর্থ বেঙ্গলে এক এস. পি. তাই করেছিল।

তপন বেরিয়ে আসে। সোমজিতের সপ্রশ্ন চোখ। তপন তাকায় না।

টাইগার ওর সঙ্গে হাঁটতে থাকে।

—আজ থেকেই শুরু করলে?

—শুভস্য শীঘ্রম্।

সোমজিৎ, অভীক তাজ্জব হয়ে গেছে।

-এই তো শুরু হলো। যদ্দিন টানা যায়। কাল সকলকে নিয়ে বসতে হবে। নকশাটা বুঝিয়ে দিতে হবে। চলো, একবার থানায় যাই।

ও. সি. চমকিত, সন্ত্রস্তও।

আপনি আবার কষ্ট করে এলেন ?

- রঙিন কোথায় ?

হাসপাতালে ড্রেস করাতে গেছে ।

এ রকম অ্যাকশান আমি আরো করতে পারি । আমাদের ছেলেরাও হয়তো আসবে থানায়, মানে আপনিই আনবেন । তবে থানায় নো টর্চার অন্ দেম । আবার বলছি, নো টর্চার । বুঝলেন ?

--বুঝেছি ।

— আপনাকেও কতকগুলো ব্যাপার বুঝতে হবে । যখন তখন নির্দোষ লোকজন ধরে এনে হ্যারাস করবেন না । চব্বিশ ঘণ্টা বাদেই লকাপ থেকে কোর্টে তুলবেন কেস । তারপর, লকাপ-হত্যা বা লকাপে আত্মহত্যা যেন কমে ।

আপনি অবাক করে দিচ্ছেন ।

—আমি যেতে আসিনি, থাকতে এসেছি । যতদিন থাকব, ততদিন সব কাজকারবার চলবে । আপনারাও খুশি থাকবেন । তবে সকলকেই কাজের প্যাটার্ন পাল্টাতে হবে খানিক । থানা বিষয়ে পাবলিকের ঘেন্না । আপনি তো কমাতে এসেছেন, কমিয়ে যাবেন । সেই সঙ্গে পাবলিক সার্ভিস কিছু করুন । যাতে পাবলিক খুশি থাকে । আমাদের পাবলিক পুলিশকে সামান্য নড়তে দেখলেই খুশি হয় ।

- মনে থাকবে ।

— রঙিন এলে ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দিবেন ।

—দেব, আপনি আসুন ।

তপন টাইগারকে বলে, তুমি চলে যাও । আমি একাই চলে যেতে পাবর ।

—পথটা অন্ধকার ।

-- তুমিও তো একলা ফিরবে ? আমার এখনি কিছু হবে না । কিছুকাল থাকব ।

— সাবধানে থেকো ।

তপনের এই একটা কাজই টাউনকে অত্যন্ত গোলমালে ফেলে দেয় । অভীক বলে, যে কাজটা আমাদের করার কথা, সেটা তপন

করে বেরিয়ে গেল ?

সোমজিৎ বলে, তপন কোনোদিন মদ খায়নি, মেয়েদের ব্যাপারেও নোংরামি করেনি ।,

নন্দিতা বলে, তার চেয়ে অনেক নিন্দনীয়, অনেক ভয়ঙ্কর কাজ করেছে। আমি তবু বলব, আজ আমরা ওর জন্যে খুব বেঁচে গেলাম। তা ছাড়া, বেশ পার্সোনালিটি আছে।

- তা আছে, বরাবরই আছে।

নন্দিতা বলল, আমি ওদের বিশ্বাস করি না, এটা ও স্টান্ট দিচ্ছে ছাড়া কিছু নয়।

অভীক বলল, কেন দিচ্ছে ?

সোমজিৎ বলল, দেখাই যাক না।

দীনুবাবুর বাড়ির খোলনলচে পালটে গেল। আউট-হাউসে "বসুন্ধরা, জমি-ভূমি উন্নয়ন ও সুলভে গৃহনির্মাণ করিয়া থাকে" হোর্ডিং ঝুলে গেল। এটা না কি ভবানীবাবুর পরলোকগতা স্ত্রীর নামে হলো। বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মোহনলালবাবু, তপন ম্যানেজিং ডিরেক্টর। মলয় বলল, "ম্যানেজ করবে, আবার চালাবে, নকশা ভালো।"

শম্ভুবাবু বলল, ভবানীর ক্ষ্যামতা আচে বলতে হবে। বউ কি আজ মরেচে ? আহা ! সাক্ষাৎ মা দুর্গা যেন। তাকে ভোলেনি আজও। তার একটা ছবি থাকলেও হতো।

আউট-হাউসের মাপও ছোট নয়। দীনুবাবুর সুদিনে এখানে আট-দশ জন থেকেছে। শম্ভুবাবু বলল, সব ফার্নিশ করা হচ্ছে তপন, তোমার ঘর দেখে নাও।

দোতলা বাড়িটির পেছন দিকে বাগান থেকে সোজা আরেকটি সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়। ঢাকা বারান্দা, তিনটি ঘর, একটি বাথরুম।

তপন বলল, কোণের ঘরটা। সঙ্গে বাথরুম আছে। জানলায় জাল চাই। চৌকি তো রয়েছে। দেয়াল-আলমারিও। একটা টেবিল চেয়ার হলেই চলবে।

—আর কিছু নয় ?

—আর কি ?

—একটা গডরেজের আলমারি তো লাগবেই। তুমি ওপরটা জুড়েই থাকো। তোমার লোকও তো থাকবে।

—দেখুন, ক'দিনে হবে ?

—দিন সাতেক।

শঙ্কুবাবু মাথা নাড়ে।

—দীনু বলত, বড় বাড়ি ছেড়ে এখানে থাকবে। শুধু ও আর বউ। মানুষ ভাবে এক, হয় আর।

শঙ্কুবাবু চোখ ফিরিয়ে তপনের দিকে চায়।

—জন্ম থাকলে মরণ থাকবে। যার যতটুকু আয়ু মাপা আচে। আমার তো এক মেয়ে। ঠিকুজী-কুষ্ঠী মিলিয়ে বিয়ে, মেয়ে তিন বছরে বিধবা। তার ছেলেটা, বিভাবসু দত্ত, নাম শুনে থাকবে।

—ফুটবল খেলত।

—ফুটবল খেলত, সাঁতার কাটত, স্কুলে বরাবরে ফার্স্ট হয়েচে। আমার যতাসব্যস্ব পাবে। ওদিকেও জ্যাঠা-কাকার ছেলে নেই। সে ছিল বংশের রত্ন। সে পায়ে পেরেক ফুটে ধনুষ্টংকারে মরে যাবে, একবারও ভেবেচি ?

নিশ্বাস ফেলল শঙ্কুবাবু।

—মেয়ে তো পাগল পাগল। মেয়ের মা বিচনা নিয়েচে। আমি আর ভাবি না। তবু কাজ করে যাচ্চি। কে খাবে কে জানে ! জগত্তারণ মটে টাকা দিইচি। ঘর একটা পাব। সেথাই যেতে হবে।

—আপনার ভাই মুকুটবাবু ?

—মুক দেকাদেকি নেই অনেককাল। পেতে তার ছেলেরাই পাবে। কপালে যা থাকে !

মেয়ে বিধবা, দৌহিত্র মৃত, তবে শঙ্কুবাবু কার জন্যে এখনো ভবানীবাবুকে মদত দিচ্ছে ? টাকা হবে ? টাকার ওর কি দরকার ? শঙ্কুবাবুর মেয়ে দেখতে খুব লাবণ্যময়ী ছিল। পড়েছিল কিছু-দূর। অনেক খরচপত্র করে, এক বড়লোকের হাঁপানি, জর্জর ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে দেয় শঙ্কুবাবু। জামাই বয়সেও অনেক বড় ছিল। কেন অমন বিয়ে দিয়েছিল ?

—একন ভাবি। মণ্ডল ডাক্তারের সঙ্গে লাব হয়েছিল, সে বিয়ে

দিলে কি ভাল হতো ? তকন বুজিনি। আমাদের বংশে লাব-ম্যারেজ কেউ করেনি। আর······ঠিকুজিও মিলে গেল। যাক গে, সাত দিন বাদেই উদ্বোধন করে দেয়া যাবে আপিস।

—আমরা জমি বেচব, জমি কোথায় ?

—ভবানীবাবুতে মোহনলালে নবলে-চণ্ডীঘাট পঞ্চায়েতে অমন ষাট বিঘে ধানজমি কিনে রেখেচে কবে। আমিই কিনিয়ে দিই। এ গরমেন আসবে জানাই যাচ্ছিল, আর এরা এলে জমিজমা রাকতে দেবে না এও জানা যাচ্ছিল।

—সে তো রেললাইনের ধারে।

—নিশ্চয়। নবলে-চণ্ডীঘাট সেই স্বদেশী আমলে ফাঁসি হলো যার, শহীদ নকুল বিশ্বেসের গ্রাম।

— অত জমি ছিল কার ?

—জমি আবার কার থাকে ? কিছু জমিদারের। আর কিছু চাষীর জমি। চলে যাবে, রাকতে পারবে না, প্যাঁচ দিয়ে দিয়ে কেনা হয়েচে।

--তারপর ?

—এবারে জমি ডেবেলপ করো, বাড়ির জমি হিসেবে বেচ।

—কেউ কিনবে ?

—কিনবে না মানে ? কাঁচরাপাড়া, নৈহাটি বাড়চে, এ টাউনই কত বেড়ে যাচ্চে। টোপ ভালমত ফেলতে হবে। পস্‌পেক খুব ভাল। পুবে ন্যাশনাল হাইওয়ে, পশ্চিমে রেলপথ।

- ওখানে তো যোগাযোগ নেই।

—কাগজ পড় না ? ওখানে স্টেশন হবার জন্যে মানুষ চাপ দিচ্ছে সমানে ? স্টেশন হয়ে যাবে, এগবার কংরেস ঘুরে এসুক দিল্লীতে।

—ঘুরে আসবে ?

—নিশ্চয় ! ওরা আসবে না তো কারা আসবে ? ভারত স্বাধীন করল কে ? কংরেস, আবার কে !

—কি জানি।

—এখেনে এরা থাকুক, সেতা ওরা। ওখানে শহীদ নকুলনগর স্টেশন হয়ে যাবে। যোগাযোগ বলচ ? রেলে সর্বত্তর যাও, কলকাতা

দেড়ঘণ্টার পত। হাইওয়ে দে' বাসের পর বাস। তা ছাড়া ঝিল আচে, মনোরম যাকে বলে। গরমেন ফিশারি করুক না। প্লটে প্লটে জমি বিক্রি। আমি বলচি তপন, মানুষ একটু ফাঁকায় যেতে পারলে বাঁচবে।

—ডেভেলপ করবে কে ?

—বসুন্ধরা কোম্পানি। হাউসিং মস্ত সমস্যা। কলকাতা গেলে দেকবে টালিগঞ্জ-যাদবপুরে কত বড় টাউন করচে গরমেন, গল্‌ফগ্রীন। গরমেনই এখন জমি কিনবে কলকাতার আশেপাশে আর হাউসিং করবে। হাওয়া এখানেও লাগবে।

— টাউনেও জমি নেবেন ?

—স্টেশনের মাঠ-পারে সরকারের খাস জমিতে সরকারই করবে। কিন্তু যেখানে পপার্টি পাব···টাউনের উত্তরে কুসুমপুর আচে, ও তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও।

—আমি কিন্তু একেবারে জানি না।

জানবে কোত্থেকে ? ভুল বোজো না। জমিজমা, বাড়ি থাগলে তার দাম বোজে মানুষ। তোমার ছিল না, জান না। এখন দেকো, কপালে থাকে, হবে, তোমারও হবে। কথামৃেত পড়োচো কোনোদিন ?

—না, সময় হয়নি এখনো।

—কথামৃেত সবাই পড়তে পারে। পড়ে দেকো। ঠাকুর বলচেন, টাকা মাটি, মাটি টাকা। দেবতা ছিলেন তো। এখন মাটি ধরলে টাকা। এ কাজে যে নেমেচে সেই লাখো লাখো টাকা কামাচ্ছে। কেন, কলকেতায় এখন বড় বড় বাড়ি উটচে সব, ফ্ল্যাট বাড়ি বিক্রি হচ্চে। আমার শালার সম্মন্দি তলাপাত্তররা তিন ভাই বাঙালীর জন্যে মিডিল ক্লাস হাউসিং করচে কোঅপারেটিভ করে, কত বড় আপিস করে ফেলল। ভবানীকে বোকা ভেবো না। একন গুণ্ডা-গর্দি করার চেয়ে ব্যবসায়ে টাকা বেশি।

তপনের বলতে ইচ্ছে হলো, তাই যদি হবে, তাহলে চুল্লুর কারবারও রাখছেন, ব্যারাকবাড়িও রাখছেন কেন ?

—তোমার কাজ হবে, হাংনামা হলে বন্দ করা।

তপনের মন বলল, সে দরকার না হলেই ভাল।

—কিন্তু তোমার সঙ্গে থাগবে কে ?

—গার্ড ? আমি দেখে নেব।

—বিশ্বেসী লোক নিও। যাকে আনবে তাকেই কোম্পানিতে কোনো পোস্ট দিতে হবে। মোহনলাল বুঝিয়ে দেবে।

মোহনলালবাবু, তপনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে কাজ করার ব্যাপারটা খুব পছন্দ করবেন বলে তপনের মনে হলো না। দীনুবাবু খুন হওয়ার পর ক'দিন উনি খুবই সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। তারপর ভবানীবাবুর সঙ্গে আঁতাত হয়ে গেল। সুধীনবাবুর সঙ্গেও কি হয়নি ?

রাজনীতিতে কি হয়, কি হয় না কে বলবে !

—রঙিন খুব তেতে আছে।

– ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

তপন টাইগারকে বলল, আমাদের একবার বসা দরকার। আমরা পরস্পরের সঙ্গে চলতে পারব কি না, সেটা বুঝে নেওয়া দরকার।

—সেটা কি এখানে হবে, না কোনো নিউট্রাল জায়গায় ?

—এখনি নিউট্রাল জায়গা খুঁজবে টাইগার ? এখনো তো যুদ্ধ বাধেনি আমাদের মধ্যে।

—এখানেই আসবে ?

—তবে কোথায় ?

—ওরা তোমায় ভয় পাচ্ছে।

—এখানেই তো ভাল। সন্ধ্যার পর। কেউ থাকবে না। তোমরা চাইলে আমাকে মেরে দিতে পারবে, পিছনের সিঁড়ি ধরে নেমে যেতে পারবে।

—কি বলছ, যা তা ?

—ভবানীবাবু যা বলল, সেটা তো বলতে হবে। ভবানীবাবু বললেই পারত !

—বেশ, ওদের বলব।

—কথাবার্তা হবার আগে ওরা যেন যে-যার কারবার শুরু না করে।

—সকলেরই মনে হচ্ছে তোমার শেয়ারে সবচেয়ে বড় ভাগ পড়ল।

তপনের মন বলল, আমি চাই না কিছু। আরেকটা সুযোগ চাই। আমি আমার মতো সরে যেতে চাই।

ও বলল, পারলে আমি এখনি সরে যেতাম টাইগার।

—টায়ার্ড হয়ে গেছ ?

—বোধহয়। কিন্তু আমি তো আমার হাতে নেই।

—তোমার লাইনে আসাটাই তাজ্জব !

—না, অন্য কিছুই হতো না।

আর কোন পরিণাম হতে পারত না তপনের। রাগ, আগুনের মত রাগ ওকে জ্বালাত। বাঁচার জন্যে মাটি খুঁজে খুঁজে, মাটি খুঁজে খুঁজে, শেষ অবধি এই পরিণাম।

—ওদের বলব।

—তুমি কোথায় থাকবে ?

- ভবানীদার বাড়ি, আর কোথা ?

—তাহলে দেখা হবে। তাড়াতাড়ি কোর। ব্যাপারটা জরুরি। রঙিন কি এখনো জেলে আছে ?

—খানিকটা তো থাকবে। পাবলিকে ইনসাল হয়ে গেল। তবে তুমি থানায় যেয়ে আমাদের কথা বলেছ, ওকে হাসপাতাল থেকে ঘরে পৌঁছে দিতে বলেছ, এটা খুব বড় কথা বস।

—পুলিশ আমাদের ছেলেদের হ্যারাস করবে, সেটা আমি মেনে নেব ?

- সে জন্যেই তো বলি "বস্"। বস্‌রা ছাড়া আমাদের কথা কে ভাবে ? ভবানীদা আমাকে থানা থেকে ছাড়িয়েছে, দীনুবাবু তো মলয়কে সেবার···

চম্পকের সময়ে।

টাইগার চুপ।

তপন হাত মুঠো করল।

—তোমার ফ্রেন্ড···ভাল ছেলে···টাউনে তো আর নকশাল নেই, নইলে মলয়কে···তবু মলয় ভয় পেয়েছিল।

- হ্যাঁ, পুলিশ শেলটারই দেয়।

এই একটা কথা মনে করলে তপনের মন থেকে দীনুকে খুন করার ব্যাপারে অপরাধবোধ কিছুক্ষণের জন্যে হালকা হয়ে যায়।

নইলে ভরত, দীনু, ইরানী মন নিরন্তর গুরুভার করে রাখে।

– চলো, চলা যাক। ঘর ভাল পেয়েছ, তবে সেফটি কম। একা তো থাকবে না।

—তোমরা কি করো ?

– আমি, মলয়, থানু, বম্বা ভবানীদার বাড়িতেই।

—রঙিন ?

—বস্তিতেই আছে তিন নম্বরে।

—বিয়ে করেছে ?

—একজনকে নিয়ে আছে। তার আগের স্বামীর একটা মেয়েও আছে। রঙিন মরবে।

—কেন ?

—মেয়েটির স্বামী জেলে। ওই যে সেবারে রেলপাড়ে লড়াই হলো, কালোকে মারল।

—সেই গজু ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। গজু তো বেরোবে ক'বছর বাদে। অসুখ অসুখ করে সমানে আপীল করছে। হয়েছিলই সাত বছরের, চার বছর কেটে গেছে, যে কোনোদিন বেরোবে। বউ, বাচ্চা, বাড়ি সে রঙিনকে ছেড়ে দেবে ? এখনি রঙিন টাকাপয়সা দেয় না। মেয়েটা আমাকে বলতে এসেছিল। ভাগিয়ে দিলাম। যা পার, রঙিনের সঙ্গে বুঝে নাও। রঙিনটা হারামি আছে। ওর ঘর দখল করে থাকবে, সেখানে অন্য মেয়ে আসবে।

—এ সবের ফয়সলা কে করবে ?

– ও মায়ের ভোগেই যাবে। তিন নম্বর জানো তো, সে আরেক জায়গা। চিরকাল ইনফাইট লেগে আছে। লেবার, ঠিকাদার সাউ বসে আছে তো !

—চলো, বেরোই।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে টাইগার বলল, কি করে থাকবে ? আমি হলে ভূতের ভয়ে মরে যেতাম।

—তোমার ভূতের ভয় আছে ?

—খুব। তবে তাবিজ যা এনে দিয়েছে বেণু বউদি, এ হাতে থাকলে সংকট ঘেঁষবে না।

—ভূত নেই টাইগার। মরা মানুষের ক্ষমতা নেই কোনো।

কি যে বলো! আমি নিজে জানি! তারপর, দীনুবাবুর বাড়ি পুজোপাট করত ওর বউ, সব বন্ধ হয়ে গেল তো! ভবানী-বাবুর বাড়ি মাইনে করা পুরুত এসে ঘন্টা নেড়ে ফুলজল দিয়ে যায়। সব দিকে খুব দুরন্ত লোক। শুকুবাবুকেও সাবধান থেকো।

—তাকেও?

—সে লোক জমির ব্যাপারে কোর্টকাছারি গুলে খেয়েছে। যে কোনো সময়ে একশো বছরের দলিল তৈরি করে দাখিল করতে পারে।

—দেখা যাক। সবটাই তো যুদ্ধ।

পথ চলতে চলতে তপন ভাবল, এবার একটা মোটর সাইকেল কেনা দরকার। মোবিলিটি থাকবে। তারপর মনে হলো, বাড়ি যাওয়ার দিনও ফুরিয়ে এল। যাবার মতো কোনো জায়গা থাকবে না, এ অবস্থা খুব অসহ্য হতে পারে।

বাড়ি ফিরতেই মা বলল, সবুজ এসেছিল।

কেন?

তোকে জানি কি বলবে!

—ওকে এখানে আসতে মানা করো। বলবে, আমি ওর সঙ্গে দেখা করে নেব।

ওকে…কিছু করিস না।

—ওকে? সবুজকে? কি করব? ভয় পেও না, কথা দিচ্ছি ওকে কিছু করব না।

—কলকাতা গিয়েছিল। খেতে বোস, বলছি।

—তুমিও নাও। বাবা খেয়েছে?

—সে লোক তো আজকাল আটটায় ফেরে, খেয়েদেয়ে ন'টায় শুয়ে পড়ে।

—দেরিতে হলেও, শিখেছে।

—আগে যদি শিখত!

—এইভাবেই যেন চলে, বলে দিও।

—আর বলতে হবে না। হাত-মুখ ধো।

এ শহরে কলে জল পড়ে। পুরনো মিউনিসিপ্যালিটি, পুরনো জলের ব্যবস্থা। টাউনের টাউনত্ব বলতে ওটুকুই। নইলে পথঘাট,

জঞ্জাল, পথের বাতি, এসব ব্যবস্থা ধীরে ধীরে অস্ত গেছে। তপনদের বাড়ির কাছেই জলের ট্যাঙ্ক। পুরনো পাড়া। এদিক থেকেই জলের কানেকশান দেয়া শুরু হয়। ওরা এখনো জল পায়। মা বলে, হাসপাতালেও নাকি জল এনে নিতে হয় ভারী দিয়ে। শোনা যাচ্ছে হাসপাতালে ডীপ টিউবওয়েল বসবে।

তপন হাত-মুখ ধোয়। প্যান্ট ছেড়ে লুঙ্গি পরে। মা চেয়ে থাকে। চেহারা তো কি সৌম্য, ভদ্র! কে বলবে এই ছেলেই মার্ডারার?

—খেতে বোস।

--তোমার খাবারটাও নাও।

এ ভাবে একসঙ্গে, ভদ্রভাবে আসন পেতে মা ও ছেলে কখনো খায়নি আগে। মা রেঁধে রাখত সাত সকালে কাজে বেরোত। কাজে ঢোকে যখন, তখন দিন পাঁচ টাকা পেত। মা নিজের ভাতটা নিয়ে যেত। তপন, সুকু, বুকু, যে যারটা বেড়ে খেত। বুকু যখন স্কুল ছেড়ে দেয়, ও বরং এঁটো মুছে, বাসন মেজে রাখত। বাবা সকালবেলা খেঁকুরে, রাতে তো টং। মার ওপর চেঁচাত, ডাল আর আলুর ঘ্যাঁট, এ দিয়ে খেতে পারে কেউ?

—আরো টাকা চুনো গলিতে ঢেলে দিয়ে এস, বাড়িতে এসে যত গর্জন। এরপরে তো ডালও জুটবে না।

—মাছ কোথায়?

—বাজারে। ছেলেরা একদিন মাছ খেতে পায়?

—কামিয়ে এনে খেলেই পারে।

—লজ্জা করে না?

এ থেকেই ধুন্ধুমার বেঁধে যেত। অথচ তপনের বাবা সে সময়ে ম্যাট্রিক পাশ করেছিল। মন থাকলে বা বুদ্ধি থাকলে চটকলে চাকরি পেত, ছেলেদেরও ঢোকাতে পারত। টাউনে বহুজন তাই করেছে। তখন সুযোগ ছিল।

তপনদের বড় হবার সময়ে তো দেশভাগের পর টাউন জনারণ্য। ওপার বাংলার লোকরা ছেলেমেয়েদের স্কুল কলেজে পড়াত। জীবিকা জোটানো দুঃসাধ্য হয়েছিল। একটা গোটা তরুণ প্রজন্মের জন্য দেশে কোথাও জায়গা ছিল না। বাবা মানুষ হলে হয়ত তপন

অমানুষ হতো না। সেখানে বাবা অমানুষ হলেও সুকু বুকু ছোট মাপের সাধারণ মানুষ হয়েছে। হিসেবটা মেলানো এত কঠিন।

মা খাবার বেড়ে নেয়।

- তুমি দুটো রুটি খাও নাকি ?

- অনেক কাল।

—এমন তো নয় যে নিয়মিত দুধ, মাছ, ডিম খাচ্ছ। খাওয়া বাড়াও! কতদিন বাঁচবে কে জানে! সুস্থ আর শক্ত থাকতে তো হবে। বয়স কত হলো ?

- তোর চেয়ে কুড়ি বছরের বড়, হিসেব কর্।

- পঞ্চাশও হয়নি মা, আটচল্লিশ।

—ভাবিস না, খাব-দাব।

- আমি তো রোজ খেতে আসব না। বাড়ির ব্যাপার তুমি দেখবে। লোক রাখো, বাজার করিয়ে নাও। ভাল খাও।

মা নিঃশ্বাস ফেলল।

সব করব। তুই সামলে থাকিস।

-আমার জন্যে আর ভেব না। ভালই থাকব।

আমার মনে যে···

—জানি, এ টাউনে তোমাকে সবাই আমার মা বলে অন্য চোখে দেখবে। আমিও দেখছি, যদি তোমার জন্যে কোনো ব্যবস্থা করতে পারি। সময় হলে জানাব। সকু, বুকু, দুজনেই যেন একটু খোঁজ রাখে, সুবিধেমত একটা বাড়ি যদি পায়। তোমার নামে সেটা কিনে দেব। ওদের বলবে। যা তোমার, তা ওরাই পাবে।

- বলব। একটা কথা রে ···

- কি ?

—সবুজ বলে গেল, রেবারা ভাল আছে। কোথায় আছে তা বলল না। কাজলের বোন গৌরীর বাসায় উঠেছে। ঘর ওরাই দেবে। সৌরভ আর স্বাতীও গিয়েছিল। ওরা ক'জন মিলে একটু খাওয়া-দাওয়া করেছে। রেবাকে গৌরী কি যেন ট্রেনিংয়ে ভর্তি করে দেবে।

—খুব ভাল খবর। কিছুই তো করতে পারি নি রেবার জন্যে।

তবু সোরভরা করেছে। করবেই তো, ওরা যে মানুষ। আমি এমন অমানুষ যে রেবার নামও করি না।

—মুখে না বললেও তুই তো ভাবিস।

—রেবা বা শ্যামলের নাম মুখে আনার কোন অধিকারটা আমার আছে মা? আবার আরেকটা তরকারি?

—বড়ির সঙ্গে আলু। তুই ভালবাসতিস।

—মা, তোমাদের বাড়ি বোধহয় শিক্ষিত ছিল। তোমার কথা-বার্তা শুনে তাই মনে হয়।

—তা ছিল। আমি তো নিজেই···তাদের মুখও রাখিনি, নিজের জীবনও···কি আর বলব!

—পড়েছিলে?

—পাঁচ ক্লাস। মা মরে যেতে সংসার দেখতাম।

—যাক গে। উঠে পড়ো। সবুজের সঙ্গে আমি কথা বলব। তার ভয় নেই কোনো।

—আমার ভয় তো তোকে নিয়ে।

—এখনই ভয়ের কিছু নেই।

মা আবার নীরব। মার্ডারারের মা হয়ে সেই টাউনেই বেঁচে থাকা, চলাফেরা করা খুব মুশকিল। তুমি ভেবো না মা। আমি দেখব, অন্য কোথাও তোমাকে বাসবসত করাতে পারি কিনা! যেখানে আমি নেই, আমি কোনো অ্যাকশন করিনি, সেখানে হয়'তো তুমি নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচতে পারবে।

মা এঁটো কুড়িয়ে নিল।

রাতে বিছানায় শুতে গিয়ে, মশারিটা গুঁজতে গিয়ে তপনের আঙুলে কি ঠেকল।

একটা গোলাপী কাগজের মোড়ক। বেলপাতা, জবাফুলের পাপড়ি, বেলপাতায় সিঁদুর। কাগজটির চেহারা, তার ওপর "মা তারা" প্রেসে ছাপা শব্দগুলি তপনের আশৈশব চেনা।

"সংকটা কালী স্মরেন্নিত্যং ভয়ত্রাস বিনাশিনী—শনি মঙ্গলে ভক্তিভরে মায়ের পূজা দানে প্রাণরক্ষা, রোগভয়, ক্ষতিভয় ও চৌর্যাদি রূপ বিপদাশঙ্কা দূর হয়। মায়ের পুস্তক ক্রয় করুন ও সাক্ষাৎ ফললাভের আশ্চর্য বিবরণী পাঠ করুন।"

সংকটা কালী টাউনের এক প্রাচীন স্তম্ভ বিশেষ। দেবীমূর্তি আবিষ্কারের কাহিনী প্রাচীন লোকেরা জানে। শ্মশানের পথে সংকটা কালীমন্দিরে আজও কালীপুজোয় পাঁঠা পড়ে। বহুজন মানত করে। অতীতে, কয়েক বছর আগে, তপন নামে এক দুরন্ত বালক বার্ষিক পরীক্ষার আগে সংকটা কালীর কাছে পুজো দিত! পাশ করলে আবার পুজো।

দীনুবাবু কতবার পুজো দিয়েছে ওখানে। চম্পক খুন হবার পরেও ধুমধামে পুজো দিয়েছে। বলেছে, "মানসা ছিল। পুজো দিচ্চি।"

মা পুজো দিয়েছে, নিশ্চয় মানতও করেছে। তপনের বুকে যেন কে ঘুষি মারল। ছেলেকে বলতে সাহস পায়নি, মাথার নিচে রেখে গেছে। সংকটা কালী কি করবে মা? মাকে বুকে টেনে নিয়ে সান্ত্বনা দিতে ইচ্ছে করল তপনের। কিন্তু যে স্বাভাবিক আচরণ সারা জীবনেও করা হয়নি তা এখন কেমন করে করা যায়। মাকে তো এ কথা বলাও যাবে না, পাথরের সংকটা কালীর চেয়ে রক্ত-মাংসের ভবানীবাবু অনেক বেশি ক্ষমতাবান।

সংকটা কালীকে পুজো দিয়ে কার কবে কোন বিপদ কেটেছে? এ বড় সংকট সময় মা, বড় সংকট। তবু তপন মায়ের হাতে রাখা ফুলটা ঢুকিয়ে রাখে।

মার চোখ নিরন্তর উদ্বেগ, কাতর চেয়ে থাকা, এই ফুল, সবকিছু তপনকে দুর্বল করে দিচ্ছে। দুর্বল হলে তপন তো পারবে না। তাই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে হবে বাড়ি ছেড়ে।

তপন চেয়ারে বসেছিল। মলয়, টাইগার, রঙিন, থানু ও রবি চৌকি ও চেয়ারে বসেছিল।

টাইগার বলল, বস্, বসার ব্যবস্থাটা ভালো করা দরকার। বসের একটা বসবার ঘর থাকবে না?

—নিচে তো হচ্ছে।

—এত সিম্পল ঘর? তুমি কি মিশনে মানুষ হয়েছ?

—মানুষ আর হলাম কোথায়!

—যাক গে, কাজের কথা বলো।

—একটা কথা বুঝতে হবে যে রাজনীতিটা বদলে গেছে। এখন আর আগের নিয়মে চলবে না।

থানু বলল, এরা কি সব পালটে দেবে ?

—আমাদের ওপর তো তারা খুশি নয়। হবার কারণও নেই।

—ওদের খুশি করে চলতে হবে ?

—আমাদের কতকগুলো ব্যাপার পাল্টাতে হবে। সেদিনের ব্যাপারে রঙিন রেগে আছে, থাকতেই পার। কিন্তু টাউনে মেয়েদের সঙ্গে বেইজ্জতি অসভ্যতা আমি বরদাস্ত করব না। এই একটা ব্যাপারে বুঝে চলতে পারলে মানুষ আমাদের জ্যান্ত রাক্ষস ভাববে না।

—আর কি ?

—বলছি মলয়। তোমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমি কথা বলতে চাই না, কিন্তু দোকান-বাজার থেকে তোলা ওঠানো, কথায় কথায় মানুষকে মারপিট, এগুলোও আমি হতে দেব না।

—আমরা কি সন্নেসী হয়ে যাব, না সাধু ?

—তোমরা তোমরাই থাকবে। আর, এটা ভবানীদা'র কথা। টাইগার জানে। অন্তত ছ'টা চুল্লুর ঠেক বন্ধ করতে হবে। হরিজন পাড়ার দুটো, বাজারতলার একটা, হাসপাতালের কাছে একটা, আর দুটো নিজেরা ভেবে নাও।

—তাতে কি হবে ?

—লোকের চোখের সামনে যেগুলো, সেগুলো বন্ধ হলেই লোকও খুশি হবে। তাঁরা তো তাই চায়।

-আমাদের থাকল কি ?

—চুল্লু তৈরি করাও, চালান দাও। বাজার তো মস্ত বড়। অসুবিধে কোথায় ?

—হরিজন পাড়াটা···

—নেশা যাদের আছে তারা যাবেই খেতে। মোট কথা, ব্যবহারে একটা বদল চাই।

—হাংনামা তো এর পরেও হতে পারে ?

—হলে আমি দেখব। এ ভাবে চললে হাংনামা হবে কেন ?

—আর কি ?

পায়ে পা বাধিয়ে এদিক-ওদিক গ্যাং-ফাইট বাধিও না। থানাও বলছে, বুঝে চলুন। এই, আর কিছু নয়।

রঙিন বলে, দীনুবাবু থাকতে এ সব কথা কেউ বলেনি।

তপন আস্তে বলে, কিন্তু দীনুবাবু নেই রঙিন।

সে তোমাকেও মদত দিত।

—না। আমি দীনুবাবুর লোক নই, ছিলামও না। জেনে নিয়ে কথা বলো।

—আমি তোমায় "বস্" বলব না।

—বলো না।

—আমি তোমায় কোনোদিন…

—মার্ডারার ছাড়া আর কিছু ভেবো না। ভাবতে বলছি না। তবে এটা ভাবতে বলছি, মার্ডারার কিন্তু মার্ডার করে।

—আজ নয় দিন এলে বলব।

—নিশ্চয়। শোনার মতো কথা হলে শুনব।

টাইগার বলে, কথা খতম?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়।

তাহলে সভাভঙ্গ। শুকুবাবু নতুন কোম্পানি করছে, পুজো দিয়েছে। সবাই প্রসাদ খা।

থানু বলে, সন্দেশ?

তপনদা, বস্ তো মাল খায় না। ভাবছিস কেন? আজ আমি খাওয়াব তোদের। মিলিটারি রাম। তবে একটা কথা বুকে হাত দিয়ে বলে যাব, ভবানীদা বলো, দীনুদা বলো, এত কাছে ডেকে কথা কয়নি তোদের সঙ্গে।

মলয় বলে, থাক্। আমি যা ভাবছি, তপনের একা থাকা ঠিক নয়।

—হয়ে যাবে ব্যবস্থা মলয়, ভেবো না।

—শিফ্‌ট করছ কবে?

—চলে এলেই হলো।

টাইগার সকলকে জল দেয়। ওরা জল খায়। তারপর নেমে যায়।

তপন ঘর বন্ধ করে নেমে আসে। কেয়ারটেকারকে বলে, আমি

চললাম।

--পেছনটা বন্ধ করেছেন ?

—করেছি।

নেমে এসে ও বাজারের পথে চলতে থাকে। বাংলা ছবি "আরোহী" আবার দেখাচ্ছে। চায়ের দোকানে বিমর্ষ সবুজ বেঞ্চে বসে আছে। টাউন যত ছড়ানো, সে আন্দাজে একটা হল বোধহয় যথেষ্ট নয়।

—সবুজ !

– তপনদা ?

– উঠে আয়, কথা আছে।

সবুজ বিবশ, যেন যন্ত্রচালিত।

চল্, পার্কে বসি।

বাজার ছাড়িয়ে জায়গাটি ধূলিঅবসন্ন, ছেঁড়া কাগজে, জঞ্জালে বোঝাই। নন্দবাবু বলেছিল, পার্ক হবে। পার্ক হয়নি, তবু সবাই বলে "পার্ক"।

ভীষণ নোংরা।

-- একটু পাবলিক জায়গাতেই বসি। নইলে তুই আবার ভয় পাবি।

—চলো।

ওরা মাঠের মাঝামাঝি বসে।

—এটা পার্ক হলে মন্দ হতো না।

কে করবে, তপনদা ? টাউনকে ভালবাসে কেউ ?

- কি বলবি বলে গেছলি ?

আমার একটা কাজ চাই তপনদা।

– আমার কাছে ?

—লেখাপড়াও করলাম না, লোফারিই তো করি। কি করব ! বাড়িতে মার গালাগালি, দাদাকে দেখ আর আমাকে দেখ। টিকিট ব্ল্যাক করে টাউনে ক'পয়সা হয় ?

—তীর্থকে বলে দেখ্ না। ও সুধীনবাবুকে বলে-কয়ে কোথাও তোকে ঢোকাতে পারে।

- তীর্থদা···দাদার···অপোজিট রাজনীতি করে ··দাদার সঙ্গেই

কথা বলেনি জেল থেকে ফেরার পর…হোমগার্ডে লোক নিল হোমগার্ডের কাজ, বলে ক্যারেকটার সার্টিফিকেট চাই। আমাকে কে সার্টিফিকেট দেবে বলো ?

—দাদাকে বলিসনি ?

—দাদা কি করবে ? তার নিজেরই…

—কি পারিস তুই ? চেহারা তো বাগিয়েছিস…

—তোমরা কোম্পানি করচ অত বড়…

—তোর মতো কত ছেলে আছে সবুজ ?

—সে অনেক।

—না না, বিশ্বাস করা চলে…

—আমরা সাত-আট জন খুব বন্ধু।

—মদ খাস না তো ?

—না না, ছি ছি !

তোর চলে কি করে ?

—চলচে আর কোতায় ?

—দেখব সবুজ। নিশ্চয় দেখব। তবে কাজ পেলে মন দিয়ে কাজ করতে হবে।

তোমার কাচে, তপনদা ?

—না, সবুজ। আমার কাছে নয়।

—রাঁঙনকে সেদিন ঠ্যাঙালে তুমি, সকালে খুব চমকেচে তপনদা।

—তুই ওদের সঙ্গে মিশিস নি তো ?

—না, ভয় করে।

—দেখব। নে, টাকা ক'টা রাখ্

—এ যে একশো টাকা !

—জামাপ্যান্ট কিনে নে। আর ব্ল্যাকিং ছেড়ে দে। ও কাজ ভাল নয়।

—একটু দেকো।

—নিশ্চয় দেখব।

—মাঝে মাঝে মনে হয় একটা কিছু করে বসি।

জানি। আমারও মনে হত।

সবুজের থুতনিটার মাঝে খাঁজ, ময়লা রঙের মধ্যে মুখ-চোখ ভাল। শ্যামলের সঙ্গে মিল খুব কম। সবুজের অবস্থা তপন জানে। একসময়ে তপনও সর্বদা জ্বলে থাকত। সে জন্যেই তো ভবানীবাবু পেরেছিল টোপ খাওয়াতে। ভবানীবাবু সুধীনবাবুর সঙ্গে জনসভা করবে। তপনকে সবাই বলবে মার্ডারার।

চল্, ওঠা যাক।

- একটা কাজ পেলে অনেক ছেলেই লাফাঙ্গা হয়ে ঘুরে বেড়াত না। রেসপেক্ট করে না কেউ। কবে বাড়িতে কি করেছিলাম, মা এখনো বলে চোর।

—তোদের এক দিদি ছিল না ?

- আপন নয়, জাস্তুতো। সবাই সমান তপনদা। তার বরের ভাল ওষুধের দোকান দমদমে। কত ডাক্তার, কত নার্সিংহোম চেনা আছে। মা নিজে বলল আমাকে একটা কাজ দিতে। দিদিকে বললাম, দোকান ঝাঁটপাট দেবার কাজই দাও। তা দিদি বলল, স্বভাব কেমন তা তো জানি। দোকানে চুরি করবে। ওদের কথা ছাড়ো। দাদা রাজনীতি করল, ব্যস, সেই থেকে এমুখো হয় না।

—চলছে কি করে ?

আমি, মা, দাদা থাকতে দাদা, একটা ঘরে থাকি আমরা। বাকি ঘর দুটো ভাড়া। আমগাছটার নিচে পানের দোকান করেছে একজন। খুব কষ্ট করে চলে। নইলে মা ইস্কুলে মেয়েদের পোঁছবার কাজ নেয় ?

—চল, রাত হয়ে যাচ্ছে। আমি দেখব তোকে। তোর মা, দাদা আপত্তি করবে না ? আমার সঙ্গে থাকলে ?

কে কার, তপনদা ? আর, কাজ করলে দাদা খুশিই হবে হয়তো ?

বউদি রেগে যাবে !

—আমি ওদের ওখানে আর যাই কতবার ! কাজ না পেলে চুরি, ছিনতাই ধরতে হবে। ও কাজ করতে যেয়েই লোকের হাতে বেধড়ক মার খেয়ে পীতমটা মরে গেল।

—পীতম কে ?

--তিন নম্বরে থাকত। তিন নম্বর জান তো, মারতে মারতে মেরেই ফেলে।

ওসব ভাবিস না। শুধু চিন্তা হয়, আমার সঙ্গে কাজ করলে তোর না বিপদ হয়!

সবুজ হাসল। ওর দাঁত খুব ঝকঝকে।

টেম্পোরারি করে দেবে, এই তো? আমরা পার্মানেন্ট হতে পারব না তপনদা। জাঁতাকলে পড়ে গেছি বলতে পার। একেবারে পীতম হতে পারছি না, ভদ্দরলোক, ভদ্দর ঘর, সেটা মা বলে বটে, কিন্তু সেটা তো মিথ্যে। বাবা ছিল ড্রেসার, মরল অকালে। দাদা টিউশনি করে পড়ত, বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল, জেল খাটল, ফিরল। মা ইস্কুলের ঝি বললেও হয়। আমরা ভদ্দরলোক কিসে? চম্পকদার মা-বাবা ভদ্দরলোক ছিল বটে। চম্পকদা মরে যেতে তারাও চলে গেল টাউন ছেড়ে। তীর্থদা আমাদের ঘেন্না করে। সোমজিৎদা বরং দেখলে কথা বলে, একদিন সিগারেট দিয়েছিল।

তুই টাউনে যা যেমন শুনবি আমাকে বলে যাস।

--ভবানীবাবুকে বলতে হতো। না বললে ধমকাত। কিন্তু তোমাকে আমি বলে যাব।

চল, উঠি।

—তোমার সঙ্গে বসে কথা বললাম, এ তো পাঁচজন দেখল। কাল থেকে সবাই আমাকে একটু "ইয়ে" করবে।

—চল্। হয়তো কালই তোকে নিয়ে বেরোব।

—একটা কাজ।

—কোম্পানি চালু হোক। আজ থেকেই তুই আমার পে-রোলে থাকবি। কাজ দেখে মাইনে দেব।

## ॥ চার ॥

"বসুন্ধরা" কোম্পানির যে এত তাড়াতাড়ি বাড়বাড়ন্ত হবে তা এ টাউন আগে বোঝেনি।

টাউন তপনের ওপর সতর্ক নজর রেখে চলছিল। তীর্থ বলেছিল, নন্দিতা মিছে বলেনি, এটা ওর স্টান্ট।

সোমজিৎ বলল, স্টান্ট বলো কেমন করে, মানুষ যখন খুশি ?

মানুষ সত্যিই খুশি হয়েছিল। তপন, সবুজ, কুশ, ক্ষিতি ও বীরুকে নিয়ে টাউনের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ঘুরছে। তপন মোটর সাইকেলে, ওরা সাইকেলে। তপন ভবানীবাবুকে বলেছে, টু-হুইলারের যে খরচ, সেটা আমার টাকা থেকেই কেটে নেবেন। এটাও ইনভেস্টমেন্ট। টাউনের লোকের গুডউইল তো চাই।

—তা বলে সবুজকে নিচ্চ ?

—পুরনো রিক্রুটদের মধ্যে এক টাইগার বাদে কার ওপর আপনি নির্ভর করতে পারেন ? যারা মেয়েদের সঙ্গে অসভ্যতা করত, তাদের নিয়ে বলে বেড়াব এ টাউনে মেয়েরা নিরাপদ ? যারা চুল্লুর কারবার করছে, তাদের নিয়ে গিয়ে ঠেক তুলে দেব ?

—এতে তোমারই লাভ হবে।

—আমি কে, ভবানীদা ? আপনি আমার বস্।

—আমি তো চাই তুমি বস্ হও।

—বস্ই হব। সন্ত্রাস সৃষ্টি নিরন্তর না করেও হওয়া যাবে বোধহয়।

—দেকো, তোমার ফ্রী হ্যান্ড যখন।

—দেখবেন, তিন নম্বরও আপনার অনুগত হয়ে যাবে।

—ও বাবা, কাদের ডেন !

—দেখাই যাক না।

—তা এ সব টু-হুইলারের টাকা তুমি দেবে কেন ?

—ওদের দিয়ে দেব ওগুলো।

—গিফ্ট ?

—না। ইনভেস্টমেন্ট। যে কিছু পায়নি সে সামান্যেই গলে পড়ে। নিজেকে দিয়েই বুঝি। সে কৃতজ্ঞ থাকে। আপনি আমায় রাস্তা থেকে তুলে এনেছিলেন, আমি কৃতজ্ঞই আছি।

—ভেরি ইনটেলিজেন্ট কর্তা তপন। দেকো !

—তীর্থরাও খানিক চুপ করবে। সুধীনবাবুর সঙ্গে আপনার আঁতাত, মানে ঘনিষ্ঠতা নিয়ে ওদের মনে কিছু প্রশ্ন আছে, থাকবে না।

—পলিসিও বোঝ দেকচি।

—আপনাকে দেখে দেখে···

· কি বুঝলে ?

—যে বিয়ের যে মন্ত্র···যখন যেমন তখন তেমন, চলতে হয়। নইলে গোলমাল হয়ে যায়। লাইনে থাকতে হলে আপনাকেই তো দেখে শিখতে হবে।

যাক্! বুজোচো সেটা! দীনুর তো কিছু শেকার মন ছিল না। ও নিজেই সব খেতে চাইত।

—কাট্ দিত না ?

—সে অনেক কতা। যাক! যে চলে গেচে তার কতা বলতে নেই। সঙ্গে তাহলে মলয়দের রাকচ না ?

—বিশ্বাস পাই না দাদা। সত্যি বলচি।

—তোমার ছেলেরা টাপ্ তো ?

—তা তো বটেই। আমি যেমন ছিলাম। শিখে যাবে।

—এটা মন্দ করচ না তপন। টাউন বুজবে, এরা সমাজবিরোধী দমন কত্তে চেষ্টা করচে, সবটা পারচে না।

—হ্যাঁ, সিধে হিসেব।

—ভাল ভাল লোক জয়েন হচ্চে কোম্পানিতে। সকলেই চেনা-জানা লোক।

—ও!

—যেমন ধরো বেলডাঙার মিহিরবাবু। বড় কন্টাকটার হে। কলকাতায় আপিস, কেষ্টনগরে আপিস। পারুলডাঙায় কেন, কয়েকটা স্বাস্থ্যকেন্দ্র করল, ন্যাশনাল হাইওয়ের রিপেয়ার করে। দেকে তুমি বুঝবে না সে কি দরের লোক! এবারে শিলিগুড়িতে সরকারী কোয়ার্টার করচে। রজতবাবু সিমেন্ট কন্টাকটার। ভাল লাইন নিয়েচে। মস্ত কোটা বের করেচে, আর দেদার কামাচ্চে। অরুণ সিং তো রাজা লোক।। স্টীলের কোটা বের করেচে, হরদম রেলের কাজ পায়। মোহনলালের জাসতুত ভাই সোহনলাল আমাদের এদিকে নর্থ বেঙ্গলের যত রেলস্টেশন, তার কাজ পায়।

—এঁরা থাকবেন ?

—অবশ্যই। রজতবাবু চাকদার লোক। অরুণের বাড়ি বেলঘরিয়া। ওই যা শহরবাসী। সোহনলাল বসে আচে

কাঁচরাপাড়া।

—ওঁর ট্রানসপোর্ট কোম্পানিও তো আছে?

—সে বিরাট। সে ডানলপে। সব কংরেসের লোক, কংরেসেই আচে। দিল্লী থেকেই সুবিদে সব আদায় করেচে। এরা না থাকলে পারতাম? সুধীনবাবু! তোমায় একটা সির্নাসয়ারিটি কতা বলি তপন, দেকে নিও। সুধীনবাবুরা বরাবুরে কংরেসের অ্যান্টি হয়ে থেকেচে, আজও থাকবে। আসল টাকা কোতায়, সে বুজতে এদের ক্ষমতা নেই। এরা ভাল কাজ করতে এসেচে, করুক না। জানি না ক'দ্দিন থাকবে, তবে তদ্দিনে আমরা ডেভলপ করে বেরিয়ে যাব। টাকা যারা করে নিয়েচে, তারা ঝা'ডা বদল করবে না। কংরেসে একনো অনেক মধু।

—টাইগারের খুব ইচ্ছে···

—জানি। একটা হেভি ট্রাক। মাল বইবে। সে টাকার দরকার। ব্যারাকবাড়ি থেকে কত বা উঠবে ওর? হয়ে যেত ওর। সোহনলালই করে দিত। টাইগার তা বুজল? ওকে বললাম, তার লোককেই তুমি ধানবাদে কেলিয়ে এসেচ। আমার কাচে আচ, তাতেই ওরা কোনো অ্যাকশান নেয়নি। তা বাদে অবশ্য সোহন-লালের হয়েও হাওড়ায় কাজ করে এসেচ, আমিই যোগাযোগ করিয়ে দিই। কিন্তু নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরেচ না?

—আমি জানতাম না।

—বললাম, তুমি ফেতফুল ছেলে বলে। সকলকে বলার কতা নয়, এটাও বুজো।

—আপনারা বললে চন্ডীঘাটে কাজ করবেন!

—হ্যাঁ। টাউন হয়ে যাবে, স্যাটেলাইট টাউন। আর কোম্পানি দাঁড়িয়ে গেলে, কলকাতার চারদিকে যত গরমেন্ট হাউসিং হবে, সেতাও কাজ করা যাবে।

—আপনি ওখানে বাড়ি করবেন?

—আমরা সবাই করব। জেনে রেকো, মাটির দাম বাড়ে, কমে না। আমি ঝিলের মুকোমুকি একটা ছোট বাড়ি···বুড়ো বয়সে থাকতে হবে তো! এ বাড়ি তো বউদির নামে করে রেকিচি। টাউনের ও বাড়ি বেচে দোব।

—একটা কথা বলব ?

—বলো না ! সংকোচের কি আচে ? রবি ঠাকুর বলেচেন, সংকোচেরও বিবভলতা নিজেরে অপমান ! জানি, আমিও জানি। আমার দাদারা তো সব উচ্চশিক্ষিত। আমিই যা অশিক্ষিত। কি বলবে ?

—টাউনে বাজারে ওখানে পার্কটা তো নন্দবাবু করল না। কোম্পানি থেকে ওটা ঘিরে, সাফ করে, কিছু ফুলের গাছ লাগিয়ে, জলের কল বসিয়ে টাউনকে ডোনেট করুন না। মেনটেন করবে মিউনিসিপ্যালিটি। তাতে টাউনে কোম্পানির গুডউইল বাড়বে।

—বেশ বলেচ। অবশ্য অমন জায়গায় ওটা পার্ক থাকবে না। মিটিং হবে, যাত্রা হবে, এই সব হবে। তবু দেকা যাক। ওদেরে বলব। একন আমার বাড়িটা কি করব জান ? ভাবতে পার ?

—কি করবেন ?

—নার্সিং হোম। ডাক্তার মল্লিক পেচনে লেগে আচে। লীজ দোব। রিনিউ করবে।

—টাইগাররা কোথায় যাবে ?

—ভাবতে হবে। ওদেরও হাউসিং সমস্যা হবে। বলিনি তোমায় যে হাউসিং একটা মস্ত সমস্যা হবে ?

—প্রথমেই কি নবলে চণ্ডীঘাটে যাবেন ?

একসঙ্গে দুটো পোজেক ছাড়ব বাজারে। স্টেশনের ওধারে দশ বিঘে জমির ওপর একরকম চারটে বাড়ি, পত্যেকটা চারতলা। পতি বাড়িতে বারোটা করে ফ্ল্যাট। আনন্দ তলাপাত্তর পাবলিসিটি করবে, নকশা পৌঁচে যাবে তোমার কাচে। দেকবে কাজের চোটে নাকেচোকে দেকতে পাচ্চ না।

নার্সিংহোম ! নতুন টাউনে বাড়ি ! ভবানীবাবুর আরো কত আর্থিক নিরাপত্তা দরকার ? বয়স তো ষাটের কাছে। বউদি আর তাঁর মেয়েরা ক'টা জায়গায় থাকবে ?

—আমার ছেলেদেরও স্টাফ করে নেব।

—সে নাও না। ওরা কিছু পাবে, পাক। চাট্টে ছেলে, নয় দু'হাজারই পেল মাসে সবাই মিলে।

ভবানীবাবু হাত নেড়ে দিল। অর্থাৎ এ সব তুচ্ছ কথায় ব্যস্ত

হবার মানসিকতা নেই তার !

—তোমার বাবদেও ধরা আছে। সে সব শুকু আর মোহনলাল জানে। ও তুমি ভেবো না।

—না।

ভেবেই বা তপন কি করত ?

এরপর টাউনে ফিরেই তপন সবুজদের নিয়ে টাউনে বেরিয়েছিল। দোকানে, বাজারে, সর্বত্র বলেছিল, দাম না নিয়ে কাউকে জিনিস দেবে না। টাকাও দেবে না। কেউ অন্যরকম আচরণ করলে নির্ভয়ে আমাকে বলবে।

এ কথাও বলেছিল, মেয়েদের নিয়ে কোনো অসভ্যতা করলে সরাসরি আমাকে জানাবে।

এ রকম কথা এ টাউন কখনো শোনেনি।

কিন্তু হরিজন পাড়া থেকে চুল্লু বিক্রির ঘাঁটি তুলে দিতে সবাই চমকে উঠেছিল। বাজারতলা ও স্টেশনের কাছ থেকে মদের কারবারও উঠে গেল।

ও সি বললেন, আমাদের করার জন্যে কিছু রাখুন ?

তপন বলল, টাউন থেকে এ সব বিষয়ে অনেক অভিযোগ আপনি পেয়েছেন। অ্যাকশান নেননি। কেন নেননি, তাও জানি। এখন বলে গেলাম, যে সব জায়গা থেকে ভাটি তুলে দিচ্ছি, সেখানে আবার না বসে সেটা আপনারা দেখবেন। আমার কাছ থেকে সহযোগিতা পাবেন, বিরোধিতা নয়।

টাউনও দেখল, সেই চেনা চেনা মুখ আর দেখা যাচ্ছে না সর্বত্র। সন্ত্রাসে কবলিত মানুষ আস্তে আস্তে বুঝতে পারল, তপন ওদের মিথ্যে আশ্বাস দেয়নি।

মলয় বলল, তোলা ওঠানো বন্ধ হয়ে গেল ?

তপন বলল, নিতে হলে কালো টাকা যাদের তাদের কাছ থেকে নাও, কিন্তু এখনি নয়।

—এখন কি ভ্যারেণ্ডা ভাজব ?

—তুমি তো এখানে বসছ।

—এটা আমার লাইন নয়।

—তোমার লাইন কি ?

—ঠাট্টা করছ ?

—আমি ঠাট্টা করি না।

- তুমি জান না ?

- অন্য একদিন উত্তর দেব। তবে মলয়, সেদিন বলেছি, আজও বলছি, ভবানীবাবুই এ সব কথায় রাজী হয়েছেন। এখন নিছক মস্তানি করে টিকে থাকা যাবে না।

দীনুদাও এ ভাবে কথা বলেনি।

আমি কি করে তার মতো কথা বলব ? দুটো লোক দুরকম হয়।

- এ সব তুমি করছ, নিজের পপুলারিটি বাড়াবার জন্যে।

না, মলয়। চোখ খুলে দেখ। সেদিন জুটমিলে ওদের মিটিংটা দেখেছিলে ? কত লোক ? মানুষ অনেক আশায় ওদের ভোট দিয়েছে। সময়টা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। একজন প্রফেসারের রুক্ষ ব্যবহারের জন্যে সেদিন কলেজে কি বিক্ষোভটা হয়ে গেল !

কি হয়ে গেল টাউনটা !

—বদলে যাচ্ছে। আর, তোমাদের কারো সঙ্গে আমার কোনো বিবাদ-বচসা নেই, এটাও বিশ্বাস করো।

—কেমন করে ? দীনুদাকে…

—আমাকে দীনুবাবু লাইনে আনেনি। তোমাকে এনেছিল। সে সময়ে তুমি কি করেছিলে ?

তপন গর্জে ওঠে তাকে মারার কথা তুমিই আগে বলো। তুমি মলয়…

—ঠিক আছে, ঠিক আছে।

তীর্থরাও তপনকে নিয়ে আলোচনা করে।

—হিসেব মিলছে না তীর্থ।

—অভীক ! এ আর কিছুই নয়, আমাদের শক্তি দেখে ভয় পেয়েছে।

—ভয় কিসের ! ও তো রাজনীতি করে না।

নন্দিতা বলে, পুলিশ যদি কথা শুনত, তাহলে আজ তপন এত

সুযোগ পেত না। পুলিশই তো এ সব বন্ধ করতে পারত।

—বন্ধ করবে কেন? পুলিশ কাট্ পেত।

—মেয়েদের অপমান করা থেকেও?

—না। তবু পুলিশ ওদের ধরত না। মস্তানরাই তো এ সব করত, না?

লালটুবাবু বলে, ভয় না ভক্তি তা নিয়ে তোমরা ভাব কেন? এই সময়ে সংগঠন করো।

তীর্থ বলে, হ্যাঁ, আমাদের উচিত হবে একটা নাগরিক ভিজিলেন্স কমিটি করে ফেলা। আমরাও চেক রাখব।

সোমজিতের চোখ হাসে, ধরতে পারলে পুলিশের হাতে তুলে দেব?

- হ্যাঁ, বাকিটা পুলিশের কাজ।

- পুলিশ যদি না করে?

- তখন প্রতিবাদ করব।

- তীর্থদা, কিছু অ্যাকশন-মার্কা কাজ ভাব।

—তপনও তো কিছু সমাজবিরোধী নিয়ে চলছে।

সমাজবিরোধী, সমাজবিরোধী নিয়েই চলে। সবুজ কিন্তু তোমার কাছে একটা কাজ চেয়ে বারবার আসত।

—শ্যামলের ভাই?

—শ্যামল রেবাকে বিয়ে করে চলে গেছে, আর তার সঙ্গে সবুজের কোনো মিল ছিল না।

তীর্থ ঈষৎ হাসল। বলল, আমি একটা প্যাটার্ন খুঁজে পাচ্ছি। তপন, শ্যামল, চম্পক, সৌরভ, কাজল সহপাঠী। ওরা কলেজে গেল, তপন লাফাঙ্গা হয়ে গেল। তপন একসময়ে কংসাল হয়ে গেল।

অভীক বলল, "হয়ে গেল" বলার সময়ে আমরা আসল কথাটা কি ভুলে যাব?

— কি বলতে চাইছ?

—ভবানীবাবুর ভূমিকাটা? ভবানীবাবু তপনকে রেক্রুট করেছিল। তপন গিয়েছিল।

—এখন তপন আলোচ্য। তপন বেরোল। টাউনে এল। তারপর

চম্পক···ইয়ে···খুন হয়ে গেল। মনে হয় তপনের সঙ্গে কোথাও শ্যামলের যোগাযোগ ছিল। নইলে শ্যামল একটা মার্ডারারের বোনকে বিয়ে করে ? সেই শ্যামলের ভাইকেই তপন কাজ দেয় ?

বাবুল বলে, হ্যাঁ, দুষ্ট-চক্র।

নন্দিতা বলে, শ্যামল আর রেবার ব্যাপারটা অনেক বছরের। এটাও জানি যে তপনের সঙ্গে সম্পর্ক কাটাতে হবে এটাই ছিল শ্যামলের শর্ত। রেবা সে সম্পর্ক কেটে দিয়েই গেছে।

—তুমি জানলে কি করে ?

—রেবা আমার কাছে আসত। আমাকে বলে গেল, দাদাকে দেখলে আমার ঘেন্না করছে। ওর ছায়া দেখলেও আমি চমকে উঠছি। মা যদি চায়, যাবে। বাবার সঙ্গে সম্পর্ক আমার ছিল না, থাকবে না। মেজদা আর ছোড়দার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল, থাকবে। শ্যামলের যেমন শর্ত আছে, আমারও শর্ত আছে। সবুজকে আমার বাড়িতে রাখব না। আমি একটা পরিচ্ছন্ন জীবনযাপন করতে চাই।

- তাহলে হিসেবটা কি দাঁড়াল ?

সোমজিৎ বলল, আমরা আমাদের কাজ করে যাব। হরিজন পাড়া থেকে চোলাই মদ বিক্রি উঠে গেছে, ওদের দিকে আমরা নজর দিতে পারি।

—অত পারা যাবে না সোমজিৎ।

টাউনের হরিজনদের বিষয়ে তীর্থদের কোনো কর্মসূচী আর নেওয়া হয়নি। তারা যেখানে ছিল সেখানেই থেকে যায়। আর বারো বছরের মাথায় আবার চুল্লুর ঠেক্ বসে যায় সেখানে। কেননা মস্তানরাজ একটা তৈরি হয়ে যায়।

অভীক বলল, তপন পপুলার হয়ে যাবে।

—শ্মশানের কাছে চোলাই বিক্রি তো রইলই।

—ওটা থাকবেও। শ্মশানের ডোমরাও খায়। সোজা কথা, কয়েকটা স্টেপ নিল তপন, তা দরকার ছিল। আমরা করিনি, ও করেছে।

—ও, বাজারী, দোকানী, এদের কৃতজ্ঞতা !

ওদের কি অত অবজ্ঞা করা যায় ?

--অবজ্ঞা করছি না।

—ওরাও আমাদের ভোট দিয়েছে। তার বদলে কিছু কাজ তো আশা করে।

নন্দিতা বলল, মেয়েরা কিন্তু খুব বলছে যে এতদিন ওদের নিরাপত্তার কথা কেউ ভাবেনি।

-ও সব তপনের ভাঁওতাবাজি।

ভাঁওতাবাজি যে নয়, তা খুব তাড়াতাড়ি প্রমাণ করে দেয় তপন। এ টাউনে মেয়েদের সঙ্গে অসভ্যতা করার লোক অনেক রকম। হাসপাতালে নার্সদের কোয়ার্টার ভেঙে গিয়েছিল, কন্ট্রাকটরের কেরামতিতে। আবাসন পুনর্নির্মাণ এখনো হয়নি। ওরা থাকছিল হাসপাতালের যক্ষ্মা ওয়ার্ডে যেটি তৈরি হয়েছে, চালু হয়নি। ওয়ার্ডটি হাসপাতালের পেছনে, মেন বিলডিং থেকে দূরে।

টাউনের কিছু লোক এখন পয়সা করে ফেলেছে। যেমন রেশন ডীলার অব্জবাবু, বড় বড় ওষুধ কোম্পানির স্থায়ী ডীলার রতনবাবু। অব্জবাবুর ছেলে জয়, রতনবাবুর ভাইপো চাঁদ ও তাদের কয়েকটি বন্ধু ওই নার্সদের জীবন দুর্বিষহ করে তোলে। ওরা পাঁচজন স্কুটার চালিয়ে ঘোরে, লম্বা জুলপি রাখে, সন্ধ্যায় কালো চশমা পরে এবং মেয়েদের আওয়াজ দেয়।

বীরু তপনকে বলল, জয়ের গ্যাংটা সুমনা নার্সের পেছনে লেগেছে। ওকে তুলে নিয়ে যাবে। অসভ্যতা করছেই, বলেছে জানাজানি করলে অ্যাসিড মারবে।

-তোকে কে বলল?

--আমার মা ওদের রান্না করে।

—অ্যাসিড মারবে!

-এই ভয়ই তো পাচ্ছে। এর আগে রুমা নার্সকে···

-অ্যাসিড মেরেছিল?

--না, তুলে নিয়ে যায়, ফেলে দিয়েও যায় ইলেকটিক আপিসের মাঠে।

—কেস হয়নি?

--কে করবে? রতনবাবুর ভাইপো চাঁদ আছে না? রতনবাবুর হেভি ইনফ্লুয়েন্স।

-রুমা নার্সের কি হল?

—কাজ ছেড়ে পালায়।

—অন্য নার্সরা কিছু বলে না?

—না তপনদা, কোন ভরসায় বলবে? জানের ভয় সবাই করে। জানের ভয়, ইজ্জতের ভয়, মুখে-চোখে অ্যাসিড মারলে!

—কোন টাইমে যায় ওরা?

—ঠিক সন্দের মুকে বেরোবে। স্টেশনে একটা আড্ডা ভানুর স্টলে। ওখানে ট্যাবলেট খায় বোধহয়, জানি না। তারপর ওরা নার্সদের কোয়াটারের ওখানে।

—হাসপাতালের ওখানেই?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, হাসপাতাল তো চাঁদের ঘরবাড়ি।

—আমার সঙ্গে থাকবি আজ তোরা।

বীরুদের হাতে সাইকেলের চেন ছিল, তপনের হাতেও। সন্ধে সাতটাই হবে। নার্সদের কোয়ার্টারের দরজা-জানলা বন্ধ। ভিতরে আলো জ্বলছিল।

চাঁদ বা জয় কোনো প্রতিরোধ আশা করেনি। ওরা স্কুটার রেখেই ঢুকেছিল, উঠেছিল বারান্দায়। তপন আগে জয়কে ধরে, বীরুরা ধরে অন্যদের।

—এই, ছেড়ে দাও।

—দেখে নে, কে ধরেছে!

—এ কি! আমি···আমরা···

—বলিনি টাউনে মেয়েদের অপমান করলে শিক্ষা দেব? দীনু-বাবুর জমানা কেটে গেছে, তোদের মাথায় ঢোকেনি!

—আমি···অব্জবাবুর ছেলে!

—এবার কোন বাপ তোকে বাঁচায় দেখ্!

খুব দক্ষ নিপুণতায় ওদের পেটানো হয়। ওদের আর্তনাদে ভিড় জমে যায়। তপন ঘুষি মেরে চলে একের পর এক, একের পর এক।

তারপর, রক্তাক্ত, অবসন্ন ছেলেগুলিকে ছেড়ে দিয়ে বলে, টাউনে যে মেয়েছেলেকে অপমান করবে, তার এই হাল হবে। হাসপাতালেও অনেক কীর্তিকাহিনী হয়, আমি জানি। কে কোথাকার স্টাফ্, কে কার ছেলে, আমি পরোয়া করব না।

নার্স কোয়ার্টারের জানালা খুলে গিয়েছিল। তপন হেঁকে বলে, কিরে! আর কোন নার্সকে তুলে নিয়ে যাবি? বল্। তোর মাথাটা নামিয়ে দিয়ে যাই।

জয়ের মাথায় জুতোর ঠোক্কর মারে ও।

– না···কোনোদিন না···

—তোদের মেরে ফেললেও আমার রাগ যাবে না। পাবলিকও আচ্ছা! এরা নষ্টামি করেই যাচ্ছে। আপনাদের হাত ওঠে না কেন?

কে যেন হেঁকে বলে, পুলিশ কিছু করে না।

—পুলিশ বাঁচাক ওদের এসে। চল্, থানাকে বলে যাই। ওরা পড়ে থাকুক।

– পালাবে!

উঠতে পারবে না। কি হে চাঁদ! পালাবে?

চাঁদ গোঁ গোঁ করে।

ও. সি বলে, এটা কিন্তু···

—বাড়াবাড়ি হয়ে গেল?

—বানে, অব্জবাবু···রতনবাবু···

—নষ্টামির শাস্তি একটাই। আপনারা তো ওদের গায়ে হাত দিতেন না। আমি সে কাজটা করে দিলাম। তুলে আনুন ওদের, ওরা কেস করুক।

কেস ওরা করে না।

রতনবাবুরা মরে থাকে। ডাক্তার মল্লিকের নার্সিংহোমে ওদের চিকিৎসা হয়। পরে ডাক্তার মল্লিক তপনকে বলে, দুজনের গোড়ালি ফ্র্যাকচার, চাঁদের আর জয়ের কলারবোন, পাঁজরার হাড় ফ্র্যাকচার। আরো অনেক ইনজুরি, তবে চোখ বেঁচে গেছে।

– এই এক অপরাধ করলে এমন কেস আরো হবে। টাকার দাপটে যা নয় তাই করবে!

– প্রাইভেটলি বলছি, আমি খুব খুশি হয়েছি। আমার মেয়ের গানের স্কুলে যাওয়া, ওদের ভয়েই বন্ধ করে দিয়েছিলাম।

– আপনারা আমাদের লুম্‌পেন ভাবেন। লোচ্চা লুম্‌পেন এখন আপনাদের সমাজ থেকেই বেরোতে থাকবে, এ ঘটবেই।

- আমার ছেলে ডাক্তারি পড়ছে।

—আপনার ছেলে অন্যরকম হতে পারে, কিন্তু এরা তো অর্থে-সামর্থ্যে আপনাদের সমান। সবুজ বা বীরু নয়। গরিবের ছেলে, খেতে পায়নি, লেখাপড়া শিখতে পায়নি, লাফাঙ্গা হয়ে গেছে।

—হ্যাঁ···সত্যি বলেছেন।

এ ঘটনায় টাউনে হইহই পড়ে যায়। বীরু বলে যায়, হাসপাতালেও কিছু স্টাফ মেয়েদের খুব হ্যারাস করত।

—এখন ?

—এখন সব চুপ। মা বলল, নার্সরা তোমায় ধন্যি ধন্যি করচে।

সবুজ বলল, সোমজিৎদা আমাকে বলল, তোরা ভাল কাজ করেছিস সবুজ।

—ওরা করে না কেন ?

—ওরা শুধু মিটিং করে, চাঁদা তোলে, আর কি জান ? এখন বলছে, যার যা অভিযোগ পার্টির কমিটিকে জানাও। কেউ নিজ হাতে ব্যবস্থা নিও না।

তপন নিস্পৃহ।

—তাই জানাক। ওরা কাজ দেখাক।

এরপর পুলিশও টাউনে রাস্তায় ছেলেদের পেছনে লাগে।

তপন মলয়কে বলে, এবার ওই বড়লোকদের ধরো। রতনবাবু, অব্জবাবু, নানাজন আছে।

—কি বলব ?

—মাসে মাসে আমাদের কাট্ দিক। ওরা দিতে পারে। গরিবদের ট্যাঁকে টান মেরো না। তাকিয়ে আছ কি ? দীনুবাবুকে দিত না ?

—এ টাকা কি হবে ?

—তুমিই নাও না। ওদের প্রোটেকশান দাও। নিচ্ছও তো, খবর যা পাই। নইলে রতনবাবু তোমাকে বলল কেন, টাকা নিচ্ছ, প্রোটেকশান এই দিচ্ছ ?

মলয় ঘামতে থাকে।

—সে যা করো তা করো। কিন্তু প্রোটেকশান মানে এই নয় যে মেয়েদের ওপর সপাটে জুলুম চালাবে।

টাউনে আর কোনো কথা হয় না, এই একই কথা। পরদিন তপন ভানুর দোকানে যায়।

ভানু ছিটকে ওঠে।

—আমি কিছু জানি না তপন, বিশ্বাস কর্।

—ওদের আসতে দিস কেন?

—না দিলে উপায়? দোকান ভেঙেচুরে দিয়ে গেলে কি করতাম?

—ট্যাবলেট বেচিস না?

—সাচ্ করে দেখ্। এ আমার চায়ের দোকান।

—সবুজেরা আসবে। পয়সা দিয়ে চা খাবে। ওরা আসা-যাওয়া করলে এরা আর আসবে না!

—আবার পয়সাও দেবে?

—দেবে। বিনা পয়সায় তোমরা কাউকে দেবে না কিছু।

—কে আসছে দেখ।

—কে রে? চিনলাম না তো।

—তোদের অঙ্ক সার।

রেবতীবাবু?

—হ্যাঁ, মাথাটা খারাপ হয়েছে একটু। আপনমনে বিড়বিড় করে বকে। ছেলেটে চাকরি পেয়েছিল, কি যে রোগ হলো, হাসপাতালেও ধরতে পারল না, মরে গেল! ছেলের চাকরি বউ পেয়েছে। চলেও গেছে বারাসাত। সেই থেকেই…চা খেতে আসেন।

রেবতীবাবু! তপনের শৈশবের আতঙ্ক! বৃদ্ধ এসে ওর সামনেই দাঁড়ান, চোখ কুঁচকে তাকান।

—তুমি…তপন না?

তপন প্রণাম করে, মাটি ছুঁয়ে।

—শুনলাম, ভাল কাম করছ একডা। পলটুর মায়ে কইল। ও খবর রাখে বাইরায়…। হ…দুষ্টের দমন করছ…এই কাম ভাল …শুইনা খুশি হইছি…বেশ করছ…বেশ!

তপন নিশ্বাস ফেলে।

—চলি সার…ভানু, চললাম।

—সাবধানে থাকিস।

এটাও একটা নতুন প্রাপ্তি। ভানু আর ও ছোটবেলা থেকেই পথে পথে ঘুরেছে, মারদাঙ্গা করেছে। তারপর ভানু চিনেবাদাম বেচেছে, লটারির টিকিট বেচেছে, কিছু না কিছু করেছে। দলে পড়ে যেত বটে ও, তবে স্বভাবে ভীতু ছিল। একদা ভানু আর তপন মাঠে বসে সহজে কোন ব্যবসা করা যায়, তা নিয়ে অনেক আলোচনা করেছে। এখন ভানু নিজের চায়ের দোকান করে দিন চালাচ্ছে। ওদেরই তো প্রোটেকশান দরকার।

আজ বাড়ি যাবার দিন।

মাসে একদিন যায়, মা খুব পথ চেয়ে থাকে।

আজ মা ওকে অবাক করে দিল।

—তোর সঙ্গে দেখা করবে বলে বসে আছে।

—কে ?

—সুমনা নার্স।

—এখানে ?

—আমার কাছে এল। বললাম, বসে থেকো না, সে এ সব পছন্দ করে না। বলল, দেখা না করে যাবে না।

—এ সব ঠিক নয় মা।

—বলেছিলাম।

—ডাকো।

মা উঠে যায়। ছিপছিপে, অতি সাধারণ চেহারার একটি মেয়ে। বয়স বছর পঁচিশ, স্বাস্থ্য ভালো। ওর বয়সের জন্যই হয়তো ওই ছেলেরা···

—আমার সঙ্গে দেখা করবেন কেন ?

সুমনা একটু ইতস্তত করে। তারপর মুখ তোলে।

—সব নার্সদের, অন্য মেয়ে স্টাফদের হয়ে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গেলাম।

—কৃতজ্ঞতা জানাবার কিছু নেই। আর এ বাড়িতে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন না।

—আমাকে চাকরিটা করতেই হবে। আপনি সেদিন ব্যবস্থা না করলে···

—আচ্ছা, ঠিক আছে। আপনাদের এ রকম কোনো সমস্যা হলে বীরুর মাকে বলতে পারেন। নইলে "বসুন্ধরা" আপিসে বলতে পারেন বীরুদের কাউকে। এখানে নয়।

—মনে রাখব, নমস্কার।

—নমস্কার।

সুমনা চলে যায়, মা দরজাটা বন্ধ করে দেয়।

—এরা বোঝে না, এ বাড়িতে এলে গেলে···আমার শত্রুও অনেক, আর এখানে আসছে বলে ওর ওপর বা কে হামলা করবে··· মেয়েদের জব্দ করা তো খুব সহজ।

মা নিশ্বাস ফেলে।

—শত্রু তো আছেই? তবে ভাল বলার লোকও অনেক।

—যাক গে ও সব কথা।

—তা কেন, আমি পুজো দিই শনি মঙ্গলে, তোর বিপদ আস্তে আস্তে কেটে যাবে।

—রানাঘাট গিয়েছিলে?

—হ্যাঁ, সুকু বলে, টাউনের বাইরে গ্রামের দিকে জমি, সেও পাঁচ হাজার টাকা কাঠা।

—তাই দেখুক।

—কি ভাবছিস?

—তুমি চোখ দেখিয়েছ?

—এই বুধবার যাব। তোর বাবার···পেটে ব্যথা···

—যা দরকার করো না। আমায় বলার দরকার কি মা?

—খাবি কিছু?

"না" বললে মা দুঃখিত হয়, তবু তপন বলল, আজ থাক্ মা। কাজ আছে।

- বুকুও এসেছিল রানাঘাটে।

- ওদের যাওয়া-আসা আছে, এটা ভাল। টাকাটা রাখো মা, ব্যাঙ্কে ফেলে দিও।

—আমি দিলে একটা জিনিস পরবি?

—দিও না মা। তুমি কেন দিচ্ছ তা আমি জানি। কিন্তু আমার যে বিশ্বাস নেই। মা চুপ হয়ে গেল

—সবুজ তো আসে এখানে।

—আসে!

- ও আমাকে খুব দেখে না। তুমি যে ফুলবেলপাতা দিয়েছ, আমার মাথার নিচে রাখে। রান্নাও তো ওরাই করে।

মা নিশ্বাস ফেলে।

—ওরা তো দেখবেই। তুই ওদের কাজ দিয়েছিস···কিন্তু তুই নিজে কি নিজেকে দেখিস?

মা! তুমি তো জানতে আমি কবে থেকে ঘরবাড়ি ছেড়ে মারদাঙ্গা ধরেছি।

জানতাম। আমিও কত কটুকথা বলেছি, তাই এখন মনে মনে ভাবি আর দুঃখ করি।

তুমি কি করবে? বাড়ির এই হাল···বেকার ছেলে···কটুকথা আমার মনেই নেই। আমি বলছি, আমি কি, তুমি তো জান। আমার কথা ভেবো না। ভেবে লাভ কি? আমি চাইলেও আমি ফিরতে পারব না, আর হয় অন্য কেউ, নয় পুলিশ, আমাকে ফেলে দেবে।

—পুলিশ!

—হ্যাঁ মা। মস্তানি করে চললেও মরতে হয়, ছেড়ে দিলে মৃত্যু আরোই ঘনিয়ে আসে। সেই জন্যই, দেখছ না, কিসে বাঁচতে পারি সেই চেষ্টা করছি?

—করছিস তো?

তপন জানে এ সব কথা সত্যি হয়ে উঠবে না, তবু যেন নিজেকেও বিশ্বাস করাতে চায়, মাকেও। তাই বলে, মোটা টাকা করে নিয়ে লাইন ছেড়ে দূরে কোথাও গিয়ে থাকতে পারলে হয়তো বেঁচে যাব।

—তাই কর্। বেঁচে আছিস জানলে, যত দূরেই থাকিস, তোকে না দেখেও আমি থাকতে পারব। মাঝে তো ভাবিইনি··· ফিরে এলি যখন, তখন থেকে মনে···

হাজার হলেও মা সংসারের আগুনে পুড়ে পুড়ে শক্ত ঝামা। তাই এখন বলে, তুই আয় তাহলে। রাত করিস না।

তপন প্যান্টের পকেট দেখে হাত থাবড়ে। রিভলভার। পায়ের

সঙ্গে বাঁধা ছুরি তো আছেই। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার যুদ্ধটা হয়ে যাবার পর অস্ত্র-শস্ত্রের ছড়াছড়ি। সবুজদেরও শেখাতে হবে, দিতে হবে। শেখাতে হবে, না জানে? টাইগার বলে, বর্ডারটা ধরতে পারলে…বর্ডারে এখন আর্ম স্মাগলিং হেভি টাকার ব্যাপার। লাল হয়ে যাবে।

কে জানে তপন তাও করবে কিনা!

ও উঠে পড়ে। বলে কোম্পানি দাঁড় করাতেই হবে মা। টাকা এখন জমিতে।

কোম্পানি দাঁড়িয়ে যায়।

এত তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে যায় যে তপনের মনে হয় এটা মির‍্যাক্‌ল হয়ে গেল।

কাজের পরিধি বেড়ে যায় বলে, দীনুবাবুর মূল বাসভবনেই উঠে যেতে হয় ওদের। সে বাড়ি রং ও মেরামত হয়ে, কোলাপ্‌সিবল্‌ গেট বসে অন্যরকম হয়ে যায়। আউট-হাউসটা হয় আনন্দ তলাপাত্রের অফিস।

মূল আপিস চলে যায় দীনুবাবুর বাড়িতে। তপন থাকার জন্যে দোতলায় আলাদা ব্যবস্থা করে নেয়।

আনন্দ তলাপাত্র কলকাতা থেকে মাঝে মাঝে আসে। কেননা বিজ্ঞাপন করতে হবে কলকাতায় বসে! কলকাতায় "বসুন্ধরা" আপিস হয় তলাপাত্রের বাড়ির ঠিকানায়, যাকে বলে সিটি বুকিং আপিস।

স্টেশনের ওধারে বসুন্ধরা হাউসিংয়ের প্রোজেক্টে বাড়ির নকশা, প্রস্তাবিত নকুলনগরে বসুন্ধরা উপনগরীর পূর্ণ পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন হয় চোখ ধাঁধানো।

ভবানীবাবু বলেছিল বটে, বাড়ি বা আবাসনের জন্য মানুষ হন্যে হয়ে উঠবে, সে কথা এত সত্যি তাও তপন আগে বোঝেনি।

স্টেশনের ওপারে সর্বসাকুল্যে একশো বিরানব্বইটি ফ্ল্যাট যারা দশ হাজার টাকা বায়না করল, তার মধ্যে জগদ্দল, নৈহাটি, কাঁচরাপাড়ার লোকরাও আছে। এ টাউনে এত টাকা দিয়ে ফ্ল্যাট বুক করার লোক এত জন কাছে, তাই বোঝেনি তপন।

কতকগুলো নাম দেখে চেনাই গেল না এরা কে!

শুকুবাবু বলল, জেনেই বা তোমার কি হবে? রজতবাবুরা প্রত্যেকে বেনামে গোটা দুই করে বুক করে রাখচে।

—ওঁরা তো এখানে থাকবেন না।

—থাকার জন্যে কে বুক করে? ধরে রাখবে, পরে বেচে দেবে।

—এক লাখ বিশ হাজার, ত্রিশ হাজার দিয়ে লোকে ফ্ল্যাট নেবে?

—নেবে না?

—সব দিয়ে ঢুকবে?

—না, খানিক সুবিধে পাবে বই কি। গরমেন্ তো করচে না। সেখানে ফর্টি পারসেন্ দিয়ে দখল নাও। এখানে সিস্‌টি পারসেন্ দাও।

—ওই খরচে ওই ফ্ল্যাট হবে?

—অনেক কমে হবে। নিচে দোকানঘরও করে দেয়া যাবে।

—জলের ব্যবস্থা?

—সব হবে, সব হবে। ঝানু ঝানু লোকরা আচে। তোমাকে একটা অপশান দিতে বলেচে ভবানীবাবু।

—আমি? ফ্ল্যাট নেব?

—থাকো না থাকো, নিতে আপত্তি কি? পরে ঝেঁকে দিও। অসুবিদে কিচুই নেই ওখেনে।

আনন্দ তলাপাত্র হেসে বলল, নো শ্মশান। এখানে যারা যাবে তারা দীর্ঘায়ু হোক।

—তুমিই সব দেখাবে-টেখাবে লোককে। আর বাড়ি উঠবে যখন তখন ওখানে থেকেই যাবে বলতে গেলে।

—হ্যাঁ, অনেক টাকার জিনিসপত্র থাকবে।

মোহনলালবাবু বলল, না না। ওখানে তপন থাকবে না। তপন নীডেড হিয়ার। শুকু যে কি বলো, নিজেই বোঝ না। সব কথা কি তুমি বোঝ? তুমি শুধু লীগাল দিকটা দেখে যাও। তপন চেক নেবে, জমা দেবে, ওর দরকার এখানে।

—ওখানে যারা বসে আছে?

—তপনই তুলে দেবে।

—আর সুপারভিশান?

—তপন দেখুক কাকে নেবে। তপন, এটাও বুঝছ যে ফর সাম ইয়ার্স, তুমি বেশ কিছু ছেলেকে কাজ দিতে পারবে। তোমার একটা ফ্ল্যাটের অপশান রইল।

—আমার পার্সেন্টেজ কি ধরেছেন ?

—মাসে মাসে দু হাজার পাচ্ছ, মানে তুমি। আর ধরো প্রতি ফ্ল্যাটে যদি দু হাজার পাও, টোটালে অনেক দাঁড়াবে।

তপন বুঝল, ওদের তৈরি খরচা হিসেব থেকেই বুঝল যে একটি ফ্ল্যাট পিছু ওদের অন্তত বিশ হাজার টাকা লাভ থাকছে।

—অন্তত একশোটা ফ্ল্যাট বুক হয়েছে।

—তা হয়েছে।

—আমার একটা পাওনাও হয়েছে।

—এখনি ?

—পার্সেন্টেজে আমি কোথায় থাকছি তা দেখুন।

—তোমার টাকা দরকার ?

—দরকার যে কোনো সময়ে হবে, নেব।

—দেখ, ওই যারা বসে আছে, তাদের না ওঠালে কাজ শুরু করা যাবে না।

—দেখছি।

টাইগার বলল, বস্, এর মধ্যে পাঁচ আচে।

—আমি কিছুকাল আউট অফ ফোকাস ছিলাম।

—টাইগার বলে, মদ খাওয়াবে ?

—যা খাই না, তা খাওয়াব কি করে ? না খেলে যদি মুড না আসে, তাহলে কুশকে দিয়ে আনাই।

—না, তুমি টাকাটাই দাও। ওদের সঙ্গে খাব না। একটা মেয়ে এসেচে, খুব ভাল। আমি ওকে একুলিসিব রেকেচি। একদম গেরস্ত মেয়ে। ভগ্নীপোত বেচে দিয়ে গেচে, ভাবতে পার ? নেহাত এসে পড়েচে, নইলে সংসার করার মতো মেয়ে।

—তাহলে তাকে বিয়ে কর না কেন ?

—তা হয় না বস্। ভগ্নীপোতও ছেড়ে দেয়নি। খানিক নষ্ট হয়েই এসেচে। ঘর করা চলে না। আর বললাম তো, ইচ্ছে থাকলেও সেটেলমেন্ট আমার হবে না।

—তোর মধ্যে কোথায় একটা ঘরসংসারের মায়া আছে। বয়সও আছে, সরে গেলে পারতিস।

—খুন হয়ে যাব। যাগ গে, লাইন ছাড়তে বলচ আমাকে, ওদিকে নতুন নতুন ছেলে আনচ। তাদের লাইপ রিস্ক করে দিচ্চ না ?

—তাও সত্যি, যাক গে, কি বলছিলি ?

—সাউকে মনে পড়ে ? তিন নম্বরের ?

—সে তো নেই।

--তার ছেলে পূজন বাবার কাজ করছিল। সে ওখানে লোক বসিয়ে দিয়েচে, অন্তত পঞ্চাশটা ঝোপড়ি দেকবে। পূজনের চুল্লু ভাটি চলে, ওর রমরমা খুব। ওকে হটাতে পারবে না এরা।

—টাকা দিলে উঠবে না ?

—লাখ দিতে চেয়েছিল। মৌকা বুঝে পূজন পাঁচ হেঁকে বসে আছে।

--বল কি ?

—কেন চাইবে না ? ও জমি কার ছিল জান ? হাজিতলা শোনো, হাজিসায়েবদের। মোহনবাবু আর ভবানীদা জয়েন-লীজ নেয়। হাজিসায়েবের সবাই তো বাংলাদেশে চলে গিয়েছিল। শুকুবাবু ফলস নাতি দাঁড় করিয়ে দিয়ে লীজ করিয়ে দেয়। তারপর বুঝে দেক, সব লীগাল ডীড, নিরানব্বই বছরের লীজ।

—বিনে পয়সায় সসাগরা ধরিত্রী ?

--এমন কাজ কটা ক'রে রেকেচে শুকুবাবু ! আর জমির দাম এসব ফাটকাতে বেড়ে বেড়ে অগ্নিমূল্য হয়েচে। পূজন মৌকা বুঝে দাঁও চায়। স্টেশনের ওপাশে, মিউনিসিপ্যাল এরিয়া, আর জানাই কতা যে থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট বসে যাবে। এইজন্যেই তোমাকে এদের দরকার।

তপনের কপালের শিরা ফুলে উঠল।

—এ আমি বরদাস্ত করব না। কার সঙ্গে ডীল করছে, জানে না। আমার কাছে টাকাও কিছু নয়, জানও কিছু নয়। যেদিন প্রথম চাকু চালাই, সেদিন থেকেই জানি আমার জান খত্রায় চলে গেছে। আমি দেখে নেব।

- কি হলো ?

—ইজ্জত নিয়ে কথা টাইগার।

তপন নিচু, অথচ হিংস্র গলায় বলে, মার্ডারারের ইজ্জত! মার্ডারার বলেই ডেকে এনেছ, ইজ্জত দাও। কি কাজে এনেছ তা পরের মুখে শুনতে হবে ?

—আমি উঠি।

—কাল ভবানীদার কাছে যাব। গাড়ির চাবিটা দিয়ে যেও।

—থাকে, না থাকে···

—ভয় পেও না। ও আমায় মুরগি করেছে, আমি ওকে মুরগি করব। রেণু বউদিকে বিধবা করব না।

টাইগার বেরিয়ে যায়।

ভবানীবাবু চমকে উঠেছিল।

—ভয় পাচ্ছেন ? ভয় আপনি পান ?

— তুমি বসে শান্ত হয়ে বলো না।

—শান্ত হবে না তপন, ভবানীবাবু। তপন মার্ডারার। যে চাকু চালায় সে জানে যে চাকু খাবে। মার্ডারার জেনে লাখ লাখ টাকা চুরির ব্যবসায়ে যখন ডেকেছিলে, তখন পুজন সাউকে সরিয়ে দেবার জন্যে ডেকেছ! সে ক্ষেত্রে সাফ বলা উচিত ছিল। আমার ইজ্জতে লেগেছে।

—চুরি নয়, ব্যবসা।

—সিমেন্ট, লোহা, রড আর রেল কন্ট্রাকটারির কালো টাকা সাদা করার নাম ব্যবসা নয়। যেখানে প্রতি ফ্ল্যাটে বিশ-পঁচিশ হাজার নাফা থাকছে। সে টাকাও যাবে ওই টাউনশিপে।

—কি চাও বলো ?

—যত ফ্ল্যাট বুক হচ্ছে, যেমন হবে, আমার টাকাও তেমন তেমন রেডি মানি চাই। পুজনের ব্যবস্থা হয়ে যাবে, সে জন্যে দীনুবাবুর ডবল টাকা চাই। আর, এ গাড়িটা এখন আমি ব্যবহার করব।

—ভালো। তুমি তৈরি হয়ে গেচ। বারগেইন কত্তে শিকোচ।

—মার্ডারারকে নিয়ে ঘাঁটাবেন না। যে একটা খুন করে, সে জানে যে তার জানের জিম্মাদারি তার হাতে নেই। সে লা-

পরোয়া হয়ে যায় ভবানীদা।

—অলরাইট। তবে এটা নয়, তোমাকে জীপ দিয়ে দেব। তোমার তো মবিলিটি দরকার।

—আর, এটাও মনে রাখবেন, সুধীনবাবুর পার্টি ঝামেলা করবে। ওরা ঝোপড়ি বস্তি উচ্ছেদ করার বিরুদ্ধে।

—কিছু বিরুদ্ধে থাকব না। পার্টি ফাণ্ডে টাকা দিচ্ছি। আর, ক'বছরে যকন ডেভালপমেন্ শুরু করবে, ওরা জবরদখলকারীদের তুলবে না? সল্ট লেকে নতুন টাউন কি আপসে হবে? লোকের আবাসনের জন্যে লোককে উচ্ছেদ করো। কয়েক বচরে ওরাও তৈরি হয়ে যাবে। যদ্দিন না হয়, তদ্দিনে যা পার করে নাও।

—তীর্থরা, লালটুবাবুর ইউনিয়ন, বাধা দেবে না?

—লালটুবাবু ঘাস খায় না। কিছু নষ্টামি বন্দ করে তুমি হেভি গুডউইল করে, ফেলোচ। লালটুবাবুই বলছিল, তিন নম্বরটা সাফ হলে বাঁচা যায়।

—পুজনকে কোনো টাকা অফার করব না?

ওকে দশ হাজার থেকে শুরু করে লাখ টাকা অব্দি উঠেচি। ও চায় পাঁচ লাখ। ওই জমি কতয় কেনা জান?

—কত তে?

তা, ধরো রেজিস্ট্রি হেনতেন দিয়ে ষাট হাজার সেই কালে।

—বেচল কে?

—ওনার নাতি।

—আমার খবর অন্য রকম। ফল্স নাতি আমিরুদ্দীন পাঁচ হাজার টাকা পেয়েই পালায় বর্ডার পেরিয়ে। এখন নর্থ বেঙ্গলে আছে। যাক গে, সে আপনাদের ব্যাপার।

ভবানীবাবু চুপ।

—আমি চললাম।

—দেকো, কাজটা যেন···

—সে তো হবেই। তবে একবার কথা বলে নিয়ে তবে···

—তুমি যা করবে। তোমাকে আমিই বড় মুখ করে এনেচি। মোহনের তেমন ইয়ে ছিল না। বললাম, টাউনের ছেলে। মা-বোন বলে টান আচে···

—হুমকি দিচ্ছেন ? মা-বোনের কথা বলেন কেন ? ভাই বোনের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই। মাকে খরচ পাঠাই, এইমাত্র। আমাকে ভয় দেখাবেন না।

—না না, তোমাকে আমিও ভয় পাই।

—ভয় নয়, এখনো আমাকে আপনার দরকার।

যাকে দরকার, তার কাছে কাজ পেতে হলে ঠিকমত ব্যবহার করতে হবে। আমার সঙ্গে আপনি ঠিক ব্যবহার করেন নি। করেছেন ?

—ভুল তো সবারই হয়।

—হ্যাঁ ভবানীদা, তবে ভুল করে মানুষ।

—আমি কি। অমানুষ ?

—না, অমানুষ আমি।

—আপনি সুপারম্যান।

## ॥ পাঁচ ॥

"পুরাতন বিবাদের জেরে দলীয় সংঘাতে সমাজবিরোধী নিহত। পূজন সাউয়ের হত্যাকারী পলাতক। নিহত ব্যক্তি বিগত দশ বছরে···" সংবাদটি এ টাউনকে কাঁপিয়ে দেয়।

টাকা তপন গুনে নিয়েছিল। তারপর পূজন সাউয়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল।

প্রস্তাবিত বসুন্ধরা হাউসিংয়ের মাঠের মাঝে মাঝে বাবলা গাছ, কাশের ঝোপ। চতুর্দিকে ঝোপড়ি, মাঝখানে পূজনের একটি মাত্র পাকাঘর।

তপন মিউচুয়াল করতে গিয়েছিল। একা ওখানে যাওয়া দুঃসাহসিক কাজ হতো, টাইগার ও মলয়কে সঙ্গে রেখেছিল।

পূজন বলল, মিউচুয়াল করতে এসেছ তপন, তবে সঙ্গে ওরা কেন ?

—মিউচুয়ালে সাক্ষী লাগে।

—আমার লাগে না।

—তুমি নিজের ডেনে বসে আছ।

আরামে আছি। বলো।

—জায়গাটা ছেড়ে দাও পুজনবাবু।

—ওই ভবানী আর মোহনলালকে? কেন ছাড়ব? লাওয়ারিশ জমি।

—এখন ওদের। তাছাড়া হাউসিং হবে। অনেক লোক আসবে। সব পালটে যাবে।

—আমি কি বোরেগী হয়ে যাব?

—টাকা নাও।

—কত অব্দি উঠল?

—লাখ টাকা।

—হবে না।

তপন বলে, আমি বলছি, তুমি টাকা নাও, সরে যাও, আর দেখব, তোমাকে একটা ফ্ল্যাটও দিয়ে দেব।

—তিন নম্বরে বাবার তৈরি পাকাবাড়ি আছে, ফ্ল্যাট দিয়ে কি করব?

—ভেবে দেখ।

—টাকাটা বাড়াতে বলো।

—কত?

—পাঁচ বলেছিলাম, কিছু নামতে পারি।

—যেমন?

—সাড়ে চার লাখ।

—কোথায় পেঁছিব টাকা?

—ওরা সাড়ে চার লাখ দেবে?

—দেবে।

—তিন নম্বরে।

—আর নামবে না?

—না।

—তা হলে পরশু তিন নম্বরে মাঠে এসো, ধরো রাত আটটায়। পুজন বেশী টাকা চায়নি টাইগার।

—না, বেশী কি?

—এ জন্যে হাউসিং আটকে থাকবে, এটাও ঠিক নয়।

মলয় বলে, না।

—ওরাও তো কাজ করছে টাকার জন্যেই।

—নিশ্চয়।

—বাইরে এত হল্লা কেন ?

—মদ খেতে আসবে, হল্লা করে, কিছু এদিক ওদিক কাজও হয়ে যায়। মেয়েছেলে নিয়ে···কি করবে, একটা আরাম তো চাই।

—চাই তো।

—তুমি খাও না।

—না খাওয়াই।

ট্রানজিস্টার বাজছে, বাজছে। টাইগার নবটা ঘোরায়। গান উঁচু পর্দায় ওঠে।

—ভাল কিনেছ তো ?

—হাঁ ফিলিপ্‌সের মাল। সিলোন, কাঠমান্ডু, সব স্টেশন ধরা যায়।

পূজন নবটি ঘুরিয়ে দেখাতে যায়। তপন নিচু হয়, হাত তোলে। উড়ে যায় ছুরিটা। বাঁ পাঁজরায় গেঁথে যায়।

পূজনের মুখ বিস্ময়ে ঝুলে যায়। এবার গলায়, দ্রুত বাঁ দিকে টান।

ওর কাপড়ে ছুরি মুছে নিয়ে তপন উঠে দাঁড়ায়।

—চলো। দরজাটা ভেজিয়ে দাও। রেডিও শুনুক।

তারপর জীপ। ওরা বেরিয়ে যায়।

মলয় বলে, ওঃ! আমার শরীর কাঁপছে। এমন রিস্‌ক নিতে আছে ?

—নো রিস্‌ক, নো গেইন মলয়।

—ওরা যদি এসে পড়ত ?

আমাদের চেম্বার ছিল।

পূজন অনেকদিনই ওখানে থেকে যায়! তিন নম্বরে সব সময়ে ফেরে না। ফলে তিন নম্বর তেমন সচকিত উদ্বিগ্ন হয়নি। ওই মাঠেও পূজন রেডিও শোনে, ঘরে থাকে। ওরাও তেমন ভাবেনি। পূজনের রক্ষীরা মদ খেতে গিয়েছিল, প্রায়ই যায়। ওরা রাত বারোটা নাগাদ পূজনের ঘরে টোকা দেয়, ঢোকে।

তারপর চেঁচাতে শুরু করে।

—টাকাপয়সার কথা হবে, প্রাইভেট আমাদের সরে থাকতে বলল। এখন কি হবে ?

—কে এসেছিল ?

—তপনবাবু।

—থানায় যেতে হবে।

—কে যাবে ? কি হবে থানা আর তপনবাবু, গুড় আর মক্ষি যেমন।

—তবু তো বলতে হবে।

—যে বলতে যাবে, তাকে ধরে নেবে।

বিভ্রান্ত, দিশাহারা লোকগুলি এ-ওর দিকে চায়।

একজন বলে, তব্ ভাগ্ যায় ?

কেন ?

পূজনবাবু নেই হ্যায়, অব কোন্ বচায় গা ?

— বুড়ীয়া কো পুছেঁ ?

মোতি বুড়ী, একজন চুল্লু ঠেক্ মালিক। কালো থান ও কালো জামা পরে চুলে মেহেদীর রং, চোখও কটাশে, কপালে উলকি।

বিশাল শরীরটি নিয়ে লাঠির ভরে ও দাঁড়ায়।

মরে গেল পূজনবাবু ?

—হাঁ, বুড়িয়া।

—এখন তো কেউ বাঁচাবেনা আমাদের।

কে মারল ?

পূজনবাবু যদি টাকার কথাটা মেনে নিত !

—আমরা কি করব ?

থানায় যাব। কোন নাম বলব না।

—উঠিয়ে তো দেবে।

লালটুবাবুকে বলব। গরিব লোক তুলে দেবে না নয়া সরকার। আমরা দশ বছর আছি। আমাদের একটা হক নেই ? পূজনবাবু বলেছে, বারো বছর থাকলে হক লয়ে যায়।

পূজন সাউয়েব মৃতদেহ তিন নম্বরের লোকেরা ভিড় করে

দেখে। রাস্তা ও গলি থমথমে। পুজনের শালা, ভাগ্নে, এরা বসে থাকে গাড়িতে। ওর বাড়িতে বউ ও অন্য স্ত্রীলোকেরা কাঁদে।

মোতি বুড়ীদের ডেপুটেশনকে আমল দেয় না লালটুবাবু।

—কার দখল? কিসের দখল? দখল থাকলে কাগজ থাকবে। কাগজ নিয়ে এস, তখন দেখব। থেকে গেলেই দখল হয়ে যায়? তাহলে তো প্লাটফর্মে যারা থাকে, তারাও বলবে রেলের প্লাটফর্ম আমাদের।

মোতি বলে এ, লালটু! আমরা কোথায় যাব?

—আমাকে বলো না মাসি। আমি কিছুই জানি না। আমি তোমাদের বসিয়েছিলাম?

—না, পুজনবাবু বসাল।

—আমি তোমাদের তুলতেও যাইনি! যারা জমিমালিক, যা বলবে তাদের বলো গে।

—তবে যে শুনছি তেমরা ঝোপড়ি ঝোগগি উঠাতে দেবে না?

—মাসি, মেহনতী মানুষের বস্তি ভেঙে দেয়, সে এবকম কথা। তোমরা ওখানে কি কাজ করছ যে পাবলিক তোমাদের সাপোর্ট দেবে? ভাল কথা বলছি উঠে যাও। নয়তো কারা এসে ভেঙে-চুরে পিটিয়ে তুলে দেবে, কি করবে তখন?

—যাও, যাও, যাব কোথায়?

—আমি জানি না। সেই কবে স্টেশন বাজার থেকে তপন পুরনো হকারদের ঠেঙিয়ে তুলে দিয়েছিল, মনে নেই?

তুমিও বাবু, মোহনলালও বাবু, তোমাদের মধ্যে এ-ওকে মানিয়ে চলবে। গরিবের কেউ নেই।

মোহনলার বলে এবারে,পুলিশ নিয়ে ঠেঙিয়ে তুলে দিলেই হয়।

তপন বলে, না। ঠেঙাবেন কেন? আপনারা তো গুডউইল তৈরী করবেন।

—তা হলে?

—উঠে যাবার জন্যে ঘর পিছু দুশো করে টাকা দিন। আর লেবার তো অনেক লাগবে। ওদের থেকেও নেবেন।

—এ সব কি···?

—আমার শর্ত। ওরা তো তিন নম্বরের কাছে লাইন ধরে বসে

যাবে। ওখানে বাড়ি করবেন, হরদম মাল চুরি করবে, ঝামেলা করবে।

—সে সব দেখার ছেলে আছে।

—নেই। কেউ নেই। চেয়ারে বসে বলছেন, যান না, তিন নম্বর দিয়ে ঘুরে আসুন একবার। লোক জ্বলে আছে।

আনন্দ বলে, লোকটা তো সমাজবিরোধী ছিল।

—সমাজবিরোধী কলকাতায় দেখেননি? আপনাদের ওখানে ফ্ল্যাট কেনেনি কমল ঘোষ? সে কোন্ সমাজসেবক ছিল? সমাজবিরোধীদের তো আপনাদের দরকার। নইলে আমি এখানে বসে আছি কি করে? ফালতু বকবেন না।

পুজনের খুনের ব্যাপারে থানা খুব খুশি হয়নি। কিন্তু টাউন যথেষ্ট সাড়া দিয়েছিল। সোমজিৎ বলেছিল, তপনের প্যাটার্নটা ধরে ফেলেছি।

ক্রুদ্ধ, চিন্তাকুল তীর্থ বলল, প্যাটার্ন কোথায় দেখছ?

পুজনমার্কা সমাজবিরোধীদের ফেলে দাও। কেননা আরো অন্য চেহারার সমাজবিরোধীরা ময়দানে আসছে।

—যেমন?

—কারা জমি হাতিয়েছে, কারা বাড়ি করবে দেখ।

এ সব কথা ঠিক নয়।

—কেন, ভবানীবাবু ফান্ডে টাকা দিচ্ছে বলে?

—তোমার কথাবার্তা…

আমি রাজনীতি করতে এসেছি, করে যাব। কিন্তু অনেকগুলো ব্যাপারে আমার নৈতিক সমর্থন নেই।

—এ সব কথা আমাদের মিটিঙেই বোল।

—আমরা একটা কথা বললাম না, ওরা উচ্ছেদ হয়ে গেল?

নন্দিতা বলল, কি যে বলো! এরা চুল্লু ভাটি করত, জুয়া খেলত, এদের উচ্ছেদ করা চলবে না? সোমজিৎ, খানিকটা বাস্তববাদী হও।

অভীক বলল, আমি সোমজিতের সঙ্গে একমত। ছোট পাপ উচ্ছেদ হচ্ছে, বড় পাপ জেঁকে বসছে। চম্পকরা কিন্তু এদের বিরুদ্ধেও বলেছিল। চম্পকদের ভয় পেত ওরা, আমাদের ভয়

পায় না।

—ওপর লেভেলে মিলমিশ হয়ে যাচ্ছে, ভয় পাবে কেন? আমরাই এ সব কথা তুলব।

—এই নির্বাচনে দেখা যাক। বছরখানেক তো আছে আর।

—কি টাকার খেলা না চলছে! ফাটকা করে জমির দাম তুলে দেবে, মধ্যবিত্তের হাতের নাগালে আর থাকবে না কিছু।

—তপনই কি থাকবে?

—এক তপন যাবে, আরেক তপন আসবে।

সেদিন কেউ ভাবতেও পারেনি, কয়েক বছরে ছবিটা কত পালটে যাবে। সমাজবিরোধীরা আর ভবানীবাবুর শেলটার খুঁজবে না। ভবানীবাবুর চেয়ে অনেক ক্ষমতাশালী লোকদের কাছে শেলটার পাবে। তীর্থ, অভীক, সোমজিৎ, বাবুল, নন্দিতা এরা সরে যাবে। ওদের নাম হবে "বিক্ষুব্ধ"।

রাজনীতির সঙ্গে সন্ত্রাস, সমাজের নিচতলায় একাত্ম হয়ে যাবে। কংরেসের দীনুবাবুদের সন্ত্রাস সাধারণ মানুষকে বিক্ষুব্ধ ও হতাশ্বাস করেছিল, এরাও মানুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছিল একদা, এ সব কারণের যোগফলেই নতুন সরকার হয়। কিন্তু এটা ভাবা যায়নি যে সুধীনবাবুর ভাইপো আলোক একদিন বস্ হয়ে উঠবে টাউনে। একটা প্রজন্মের বহু তরুণ সেদিন সমাজ-বিরোধী হয়ে যাবে। ভাবা যায় নি, দুর্নীতি সমাজে সর্বব্যাপী হবে। সুধীনবাবু, লালটুবাবুর এত সম্পত্তি হবে!

ভবিষ্যৎ দেখা যায়নি।

পুজনের মৃত্যুতে টাউন খুশিই হয়। গেল তো একটা সমাজ-বিরোধীই গেল।

তপন বিষয়ে সন্ত্রাসের সঙ্গে সঙ্গে আরেক রকম মনোভাবও দেখা গেল। সাহস আছে যাকে বলে। পুজনের ডেনে ঢুকে পুজনকে মেরে এল!

এ সময়েই বেশ কিছু কথা বাজারে ছড়ায়।

তপনের কাছে অতীব শক্তিশালী কোনো কবচ আছে।

ওর গুরুর আদেশ, তাতেই মদ খায় না, মেয়েদের বিষয়ে খুব সংযমী।

ও এক হাতে রিভলভার ও এক হাতে ছুরি চালাতে পারে।

সবুজ বলল, বাজারে যে কত কথা !

– ও রকম বলে, দীনবাবুর নামেও নানা গল্প চলত। ও সব শুনিস না।

- আমাদেরকে সেদিন নিলে না কেন ?

তপনের চড়ে সবুজ ছিটকে পড়ল। তপন গর্জে উঠল, না। আমি তোমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাব না কোনোদিন। আরেকটা আমি হতে চাস ?

সবুজ উঠে দাঁড়াল।

হয়তো হবে, হয়তো হয়েই যাবি। কিন্তু আমি হাতে ধরে খুন করতে শেখাব না।

তারপর ঈষৎ হেসে বলল, এ লাইনে টপে ওঠা সোজা নয় সবুজ। খুব টাফ।

খুব ?

–খুব। ঠান্ডা মাথায় জান নেওয়া অত সোজা নয়।

কিন্তু গরম মাথায় নেওয়া খুবই সহজ।

রঙিন সে কথা ভুলে গিয়েছিল। রঙিন ধীরে ধীরে সর্বনাশের দিকে এগোচ্ছিল।

বীরু একদিন একটি মেয়েকে নিয়ে এল তপনের কাছে।

তোমারে কি জানি কইতে চায়।

- মেয়েটা কে ?

—রঙিনদা'র···ইয়ে···

মেয়েটি ঘরে ঢুকল। বিবাহিতা মেয়ে, বছর ছাব্বিশ বয়স হবে। সঙ্গে একটি বালিকা, বছর ছয়-সাত বয়স হবে।

ইয়া কি বলিস ? হে আমারে সংকটা কালীমন্দিরে নিয়া বিয়া করছিল, সিঁদুর পরাইছিল।

পোড়-খাওয়া শক্ত চেহারা, রঙিন উজ্জ্বল কাপড়, হাতে সোনার জল-করা বালা, গলায় হার, কানে দুল। পায়ে রুপোর নূপুর। অত্যধিক ব্রণর দাগ না থাকলে সুশ্রী বলা যেত। চোখের চাহনি খুব উত্তেজিত।

—কি নাম আপনার ?

—আমারে "আপনি" ক্যান ?

—নাম বলুন।

—পাপিয়া, অহনে দাস, আছিলাম সিং।

—কি বলবেন ?

—আমারে বাচান। আমারে না দয়া করেন, তো মাইয়াটারে বাচান।

—বীরু! বাচ্চাটাকে বাইরে বসা। এবার বলুন।

—আমি বরো বিপদে পড়ছি।

—কি হয়েছে তাই বলুন ?

—মাইয়ার বাপ ফিরতেয়াছে, আইয়া পরলে তারেও মারব, আমারেও মারব।

—গজু সিং কবে ফিরছে ?

—অহন দেহেন বিচার নাই। মাডার কইরা ধরা পড়ল, সাত বছরের জেল হইল। অসুখ, অসুখ, হেই ছুতায় উকিলরে দিয়া আর্জি আপীল করাইয়া হেরায় মেয়াদ কমল, না কি হইল, আইতাছে।

—জানলেন কেমন করে ?

—উকিল তো নৈহাটিতে। একজন খবর আইনা দিল। হে আইলে আমারে মারব। আর···

—আর কি ?

—এইজনাও বাইরাত না! কত বলছি, হে আইয়া পরব, তুমি ছাইরা যাও, হে শুনে না।

—রঙিনের সঙ্গে আপনি তো বললেন, বিয়ে হয়েছে আপনাদের ?

—হ, কালীমন্দিরে ?

—তা হলে ?

—হেও তো অত্যাচার ধরছে। আমার দেখেন দুখান ঘর, নিজ সম্পত্তি, মায়েরে সা বাবু দিয়া গিছল। পুজন সাউ নয়, তার বাপ দিচ্ছিল।

—কেন দিয়েছিল ?

—তিনি মায়েরে খুব দেখত। ওই ঘরের কারণেই সিং আমারে

বিয়া করে। নয়তো হে ছাপরা জিলার মানুষ, সেথা জমিজিরাইত আছে, আমারে বিয়া করল ক্যান? দ্যাশে জমি বেইচা সিং এহানে বারিতে আরেকখান ঘর উঠাইছে, কল বসাইছে।

—আপনি চান, রঙিন চলে যাক?

—গেলে হে যাইব। আমি যামু ক্যান ?

—ওর সঙ্গে গিয়েছিলেন কেন ?

—মাইনতাছি যে ভুল করছি। তহন তো ভাবি নাই, হে বারিতে ভাটি বসাইব, অন্য মাইয়া লইয়া নষ্টামি করব, সংসার খরচ দিব না।

—গজু ফিরে এলে মারবে আপনাকে ?

—নিয্যস মারব। আমারে কাটব, মাইয়াটারেও কি রাখব ?

—আপনি কোথাও যেতে পারেন না সব বেচে দিয়ে ?

—যাইতাম কনে ? আর বেচতেও তো টাইম লাগে। এই লোক সইরা গেলে বেবাক রক্ষা পায়।

পাপিয়া যথেষ্ট ঝানু মেয়ে, কিন্তু ওর চাহনি বদলে গেছে। ও কোন ভরসা চাইছে। কিন্তু সত্যি কথাটা তো অন্য রকম। পাপিয়া সুমনা নয়।

তপন সত্যি কথাটাই বলে ভুরু কুঁচকে।

—দেখুন, যা ঘটেছে, বা যা ঘটবে বলে ভয় পাচ্ছেন, সে জন্য রঙিন একাই দায়ী নয়, আপনিও দায়ী। সে জেলে গেল, আপনি একে বিয়ে করে বসলেন। এখন এ যেতে চাইছে না, গজু সিং এলে আপনাদের বিপদ। রঙিনকে ঢোকানোই তো ঠিক হয়নি।

—আমার মায়েও করছিল। বাবায় মালবাজারে রেলে ডাকাতি কইরা চালান যায়। মায়ে এহানে আইসা আবার বিয়া বসে। হে জনাও দিত না কিছু। শ্যাষে সাউবাবুর দয়াতে এইটুকু পাইছে। কই, মা তো খুন হয় নাই। আসপাতালে মরছে।

—জানি না রঙিন শুনবে কি না, বলব।

—আপনে কইলে ভয়ে ভাগব।

পাপিয়া চলে যায় মেয়ে নিয়ে।

—বীরু!

—কি দাদা ?

—এ সব লোককে ঢুকতে দিস কেন ?

—অরে ঠেকাইব কে ? আইয়া ঘুরতাছে সমানে। খুব বদ মাইয়া। অর মুখ কি! নিজের মাইয়ার কথা কইতে ছিল না ? অর মাইয়ার জন্য দরদ কত। শুনি তো নানা রকম ? জানি না।

—এ সব নোংরা ব্যাপারে আমি থাকতে চাই না।

টাইগার বলে, থাকবে কেন ? রঙিনকে বলে মুক নষ্ট করা বই তো নয়। সে জীবন থাকতে অমন সুকের জায়গা ছেড়ে যাবে না। তুমি বললে উলটো বুজবে। গজুই ওকে শিক্যে দিয়ে দেবে। আর পাপিয়া তো ? ও তো জানত যে গজু ফিরবে একদিন। আগে কিছু ভাবল না ? তিন নম্বর নিয়ে কেউ কিছু করতে পারবে না।

—একরকমই রয়ে গেল।

—থাকবেও।

—থাকবে কেন ?

পরিশীলিত হেসে আনন্দ তলাপাত্র বলল, নকুল বিশ্বাস স্টেশনের পশ্চিমে প্রস্তাবিত স্যাটেলাইট নগরীর আর্কিটেক্ট-ডিজাইনার ডি. পি. সেইনকে। সেইনের ঠাকুরদা নিজেকে "স্যান" বলতেন, ইলিশকে "ইল্শা" ও বেড়ালকে "মেকুর"। তাঁর ছেলে "সেইন" লিখতে শুরু করেছিলেন। এ পরিবার এখন সেইন পরিবার। "আপনারা কি বাঙালী" বললে ডি. পি. হেসে বলেন, "আমরা ভারতীয়"।

আর কি বলতে পারেন তিনি, তাঁর স্ত্রী যখন হায়দ্রাবাদ-দুহিতা, বড় মেয়ের স্বামী পুনের মহারাষ্ট্রীয়, ছোট মেয়ের স্বামী হরিয়ানার জাঠ, একমাত্র ছেলের বউ মণিপুরী ? যখন বাড়িতে ইংরিজী ও হিন্দী হলো কথ্য ভাষা ?

ডি. পি. সেইন বলছেন, থিংক বিগ। এতটা জমি, এটা অন্য-রকম মডেল কলোনি করুন। কলকাতার কাছে, সুপারমার্কেট, অ্যামিউজমেন্ট পার্ক, হাসপাতাল, সব থাকুক।

—না, প্রোমোটারদের টার্গেট বাঙালী মধ্যবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্ত। আপনি ইনটারেস্টেড ?

—না, না। আমি পছন্দ করি বম্বে। ফ্ল্যাটও কিনেছি বহুদিন আগে। আসলে পশ্চিমবঙ্গে আইডিয়া দিয়ে কিছু লাভ নেই। অন্যান্য স্টেটে হাউসিং অনেক ভালো হচ্ছে।

আমি আবার ভীষণ বাঙালী।

কি করে, জানি না। একটা ফিউচার ভিশান থাকলেই বুঝতেন, কলকাতার ভবিষ্যৎ নেই। একটা সল্ট লেক বা একটা গল্ফগ্রীন কি কলকাতাকে বাঁচাতে পারবে বলে মনে করেন?

—শহর মরে না।

—পৃথিবীর ইতিহাস দেখুন, কত শহর মরে গেছে।

—পুরনো রোম নেই, নতুন রোম কি হয়নি?

—পশ্চিমের কথা ছেড়ে দিন। ভারতের কথাও ছাড়ুন, পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ। ছিল গৌড়, হয়েছে মালদা, যা একটা স্মল টাউন মাত্র। কলকাতা দমবন্ধ হয়েই মরবে। মানুষ বাড়বে, জায়গা কমবে।

—আপনার মতো লোক বসুন্ধরা কলোনিতে দুটো ফ্ল্যাট বুক করলেন?

—আমি ফ্যামিলি থেকে বেরিয়েই গেছি। কিন্তু আমার দুই পিসিমা আছেন, যাঁদের হেলপ না পেলে আমি···দুজনেই স্কুলে পড়াতেন, বিয়ে করেননি, বয়স হয়েছে। বাবা ব্রাহ্মণ মেয়ে বিয়ে করার জন্য ঠাকুর্দা বাবাকে গেভ নাথিং। অল টু পিসিমারা। পিসিরা আবার ঢাকার বাড়ি বেচে অ্যান্ড এভরিথিং, আমাকে সাহায্য করেন। ওঁরা এখানে সেট্‌ল করতে চান!

—তাই বলুন!

স্টেশন পেরিয়ে, তিন নম্বর পেরিয়ে যেতে যেতে ডি. পি. সেইন বললেন, এ জায়গা এখন এ রকমই থাকবে।

—থাকবে কেন?

—কি চেন্‌জ হবে?

—ডেভ্‌লপ করবে।

—কিসের থেকে ডেভ্‌লপ করবে?

—এখন ক্রাইম ডেন। সে রকম থাকবে না।

—সেটা আমি জানি।

— কি জানেন, তিন নম্বরকে ?

— ও ইয়েস। চোলাই মদ, প্রসটিটিউশান্ মার্ডার, ক্রিমিনালদের শেল্টার···পুলিশ ঢুকতে ভয় পায়।

কি করে জানলেন ?

ডি. পি. সেইনের হাতের আঙুলে, ঠোঁটের পাশে ও চোখের চারদিকে শ্বেতীর দাগ। আঙুল ছড়িয়ে দিয়ে দেখতে দেখতে উনি বললেন, আমার এক বন্ধু ক্রাইম অ্যানালিসিস করেন। কলকাতার আশপাশের কিছু জায়গা নিয়ে উনি রিসার্চ করেছিলেন। এ সব জায়গায় ক্রাইমের সঙ্গে একটা টাই-আপ থাকবেই।

— কি যে বলেন !

ওয়েল, নেই কি ? ভবানীবাবু কে ? টাউনে গত দুবছরে খুনগুলো কেন হলো ? এখনো তো আপনারা সঙ্গে রেখেছেন যাকে।···

— আস্তে, আস্তে।

—এটা আলোচনা হচ্ছে। এখন এ সব জায়গা এ রকমই থাকবে। এ রকমই যাকে বলে দমফাটা, নিশ্বাস নিতে পারবেন না।

—এ রকমই থাকবে ?

—হতে পারে, জনসংখ্যার চাপ বাড়তে বাড়তে জমি ব্যাপারটা এত লোভনীয় হয়ে উঠবে যে আপনাদের চেয়ে অনেক ক্ষমতাশালী কেউ এসে এ সব জায়গা কিনে বুলডোজার দিয়ে সব ভেঙে দেবে, তুলে দেবে সকলকে।

— সত্যি ? কবে তা হবে ?

হেসে ফেলেন ডি পি. সেইন।

—শীঘ্র তো নয়। ভুলবেন না, এখন অন্য সরকার। এখন দেড়-দুহাজার লোককে সরানো সম্ভব নয়। পশ্চিমবঙ্গে এখনো গরিব, নিম্নমধ্যবিত্ত অনেক। সমাজে অগাধ কালো টাকা সবসময়ে চলাফেরা করবে, অনেক লোক ইজি মানি করবে, তখন তা হয়ে যাবে।

—এ সব কথা আর কাউকে বলবেন না।

—না, না। আপনাদের কলকাতাদের বাড়িগুলো আমার ভাল

লেগেছে। খুব ইকনমিক প্ল্যানিং। ভালই। কারা কিনছে, সেটা মাথায় রেখেছেন।

-দ্যাট ইজ অল এ ব্যবসায়।

—এ হাউসিংয়ে থাকা নিরাপদ হবে তো?

-হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটা গ্যারাণ্টি দেয়া যায়। তবে আপনি খুনজখম নিয়ে কোনো কথা বলবেন না।

—বলবই বা কেন? বিপদ হবেও না আমার, আমি তো আপনাদের কাস্টমার।

—আপনি নন, আপনার পিসিমারা।

হ্যাঁ, আমি তো পশ্চিমবঙ্গে থাকতেই পারব না। থাকব বম্বেতে। হায়দ্রাবাদে বাড়ি করেছিলাম, বেচে দেব।

আনন্দ খুব সসম্ভ্রমে তাকায়।

-এখানে এলে ল্যান্সডাউন কোর্টে ওঠেন?

—ও ফ্ল্যাটও বেচে দেব। পিসিমারা থাকেন ওঁরা চলে এলেই বেচে দেব।

দুজনে দুটো ফ্ল্যাটে থাকবেন?

—একটায় থাকবেন, একটা ভাড়া দেবেন হাউসিংটা ভাল হবে মনে হচ্ছে।

-শুধু দুজন স্ত্রীলোক থাকবেন?

—হ্যাঁ, তাই তো থাকেন। এ কি, জমিতে এখনো লোক বসে আছে? ঘর দেখছি।

না, চলে গেছে সব। এরাও চলে যাবে।

-ওই ভদ্রলোক কে? ওই যে ইয়ংম্যান? কার সঙ্গে কথা বলছেন? স্ট্রাইকিং পার্সোনালিটি।

—পরে শুনবেন। এই যে তপনবাবু? নমস্কার।

-নমস্কার।

ইনি ডি. পি. সেইন।

-ডি থ্রি, ডি ফোর কিনছেন তো?

-হ্যাঁ। ইনি তপনবাবু।

নমস্কার। এখানে কি এখনো স্কোয়াটার বসে আছে?

—আজ চলে যাচ্ছে।

তপন মতিকে বলে, তোমরা আজই যাচ্ছ তা হলে ?

—হ্যাঁ, তাই যাব। রেলের জমি থেকে আবার তুলে দেবে না তো ?

- রেলের ধার থেকে ? দেখিনি তো কোথাও।

—তুলে দিলে আপনি বসিয়ে দেবে আবার ?

—দেখা যাবে।

তপনকে ডি. পি. বলেন, আপনিও ফ্ল্যাট নিচ্ছেন ?

—ভাবিনি এখনো। চলি।

তপন এগিয়ে গিয়ে জীপে ওঠে। জীপ চালিয়ে দেয় সবুজ। আনন্দ কপালের ঘাম মোছে। নিচু গলায় বলে, জায়গাটা ক্রাইমের ডেন ছিল।

—শুনলাম। একটা গ্যাংলীডার মরে যেতে···

—আস্তে, আস্তে। ওই যে চলে গেল, দেখলেন না ? ও এখন বস্।

—ও, ডন ?

—না, বস্।

—ওই হলো, অ্যান্টিসোশাল তো ?

—হ্যাঁ, চলুন ফেরা যাক।

—ইতিহাস, মানে অপরাধের ইতিহাস পড়ুন। সমাজবিরোধীরা নিজেরাই এ ওকে মারে, খতম হয়ে যায়। এ রকম কত হয়েছে মশাই। বম্বেতে কি ক্রাইম কম ?

—চলুন, এখানে এ সব কথা বলা ঠিক নয়।

—জায়গাটা দেখে নিই একবার···আমি তো পুরো টাকা দিয়ে যাচ্ছি। বছর খানেক সস্ত্রীক ইউরোপ, আমেরিকা ঘুরব। তিনটে ছেলেমেয়েই বিদেশে। এখন তো ফিরব না। দেখে যাই, পিসিমাদের বলতে পারব। রাস্তা কি তিন নম্বর দিয়েই যাওয়া-আসা ?

—না, নর্থে যে রাস্তাটা দেখছেন ওটা বাঁধিয়ে দেবে মিউনিসিপ্যালিটি। এখানে, যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, এখানে চলে আসবে বাস। পশ্চিমে গেলেই হাইওয়ে পাচ্ছেন।

—লাভলি কৃষ্ণচূড়া গাছটা। এটা রাখবেন তো ?

—ওটা রাখা যাবে না। তবে আমি ওদের বলব গাছ কিছু লাগাতে।

—কাজ শুরু হবে রকে ?

—এম. এল. এ. উদ্বোধন করবেন। তাঁকে পেলেই···

—পলিটিশিয়ান, অ্যান্টিসোশাল, ব্ল্যাকমানি কিং নেক্সাস, এ এখন সর্বত্র।

—এখানে সে রকম ছিল না···

—আপনি নেহাত বাচ্চা। ভালমতন ছিল। আছে, থাকবেও। কে এখন টাউনে সবচেয়ে বিখ্যাত লোক, বলুন ? যাক গে, চলুন, সময় থাকতে থাকতে ফেরা যাক। পিসিদের বলতে পারব দেখে এসেছি জায়গাটা। আসলে···আমার গ্র্যান্ফাদার এডুকেশন সার্ভিসে জয়েন করেন পরে। একসময়ে নৈহাটি না বারাসাতে কোন স্কুলে ছিলেন ! তখন পিসিমারা এসব দিকে বেড়িয়ে গেছেন ছোটবেলায়। স্মল টাউন মেন্টালিটিটা এখনো আছে। বাঃ, সানসেটটা বিউটিফুল তো ?

চলুন। ফিরব তো তিন নম্বর দিয়ে।

-খুব পীসফুল।

যে প্রশান্তি ডি. পি. সেইনকে বিমোহিত করেছিল, সে প্রশান্তি সেদিন রাত আটটার পরই ভেঙেচুরে খান্খান্ হয়ে যায়।

তিন নম্বরের আকাশ কাঁপে ঘন ঘন বোমা ফাটার শব্দে, মানুষের চীৎকারে ও কয়েকটি গুলি বিনিময়ের শব্দে। ও. সি.-কে খবর দেন স্টেশনমাস্টার। লাইনের ওপারে গোলমাল হলে, তার ধাক্কা এপারে আসতে কতক্ষণ ?

অভীকরা ক্লাব থেকে বেরিয়ে লালটুবাবুর কাছে যায়।

—থানায় ফোন করুন ?

—কি হয়েছে, তাই তো বুঝি না।

-যা হয়ে থাকে তাই হচ্ছে। বারবার বলা হচ্ছে ওদিকে একটা ফাঁড়ি বসাবার উদ্যোগ নিন। স্টেশনের সিকি মাইল ওপারে তিন নম্বরকে আর কতকাল পুষবেন !

—যা তা বলতে পার না অভীক।

—আপনি তো নেতা। আমাদের সকলে কি ভাবছে বলুন তো? অপদার্থ, ইনএফেকটিভ।

—ফোন করছি।

—লোকে এটা ওটা ফয়সালা করতে তপনের কাছে যাচ্ছে কেন? কেন তাদের ধারণা হবে যে আমরা ইনএফেকটিভ? আপনারা ভুল করছেন লালটুদা। আমরা মানুষের কাছে অ্যাক-সেপটেন্স হারিয়ে ফেলতে পারি একদিন।

ফোনটা করতে দেবে? এক্সচেঞ্জও তো একটা…সত্যি, পাবলিক ইউটিলিটি সার্ভিস এভাবে ফাংশান করলে…টেলিফোন, ইলেকট্রিক…হ্যাঁ হ্যাঁ…নাইন ওয়ান টু দিন। চেষ্টা করুন…আমি লালটু বোস…হ্যাঁ, নাইন ওয়ান টু? থানা? ও. সি.-কে দিন… হ্যাঁ…কি ব্যাপার মশাই? শুনতে পাচ্ছেন না? না শুনতে চাচ্ছেন না?…কি বললেন? ড্রাইভার বাথরুমে গেছে? শীগগির যান। বি কশাস! সেবার তিন নম্বরেই একটা ভুজাওয়ালাকে গুলি করে পুলিশ…না, আপনি তখন আসেননি। দেখুন।

সোমজিৎ খুব সহজভাবে বলে, এটা হীরোর রিটার্ন, এ রকম হবেই।

—তার মানে?

—গজু সিং, মানে পাপিয়ার প্রথম স্বামী টাউনে ঢুকছে। জানাতে জানাতে ঢুকছে।

—প্রথম স্বামী মানে?

—পাক্কা ম্যারেজ। স্বয়ং সংকটা কালী রেজিস্ট্রার ছিলেন। ডিভিনিটি তো, তাকালেই বিয়ে পাকা।

অভীক বলে, বকো না সোমজিৎ।

পিকচার কিছু গোলমেলে। কেননা পাপিয়ার দ্বিতীয় স্বামী রঙিন এখনো ওখানে।

—দ্বিতীয় স্বামী?

—পাক্কা ম্যারেজ। আবার সংকটা কালী।

—দুটোতে লড়ছে?

—গজু আসছে দখল নিতে, তার গ্যাং নিয়ে। রঙিন লড়ছে দখল বজায় রাখতে। গ্যাং তারও আছে। এটার সবল কর্তৃক

দুর্বল শোষণ, বা অন্য কোনো রাজনীতিক ব্যাখ্যা নেই।

— তুমি এত খবর পাচ্ছ কোথা থেকে ?

—জনসংযোগ থেকে। তপনের কাছে নয়।

লালটুবাবু খেঁকায়, এত যদি জনসংযোগ আছে, তাহলে স্ট্রীট কালেকশান এত কম কেন ? সমর্থকদের চাঁদা ছাড়া আমাদের চলবে ?

—আমি চাপ দিতে পারি না। আর গরিবদের ওপর থেকে তোলা ওঠানো একটা সমাজবিরোধী বন্ধ করে দিল, আমি তুলছি, এটা কেমন ?

—তুমি বোঝ না।

—না। স্বীকার করছি আমি বুঝি না। আমাকে কেউ কোনোদিন বুঝিয়ে দেবে বলে আশা করে আছি, কিন্তু বোঝাতে কেউ রাজী নয়। কালচারাল কাজকর্মের বাইরে আর কিছু আমাকে দিয়ে হবে না।

—যা হোক ওদিক দিয়ে শর্টকাট করিস না।

—নন্দিতা, ভুলে যাস না আমিও টাউন প্রডাক্ট। আমি তো যাচ্ছি থানায়।

চল্, আমিও যাব।

—না, রাতে যাবি না। অভীকের সঙ্গে বাড়ি চলে যা।

সাবধানে যাস কিন্তু।

থানায় তপন বসেছিল।

ও. সি. বলছিলেন, তাড়া দেবেন না, তাড়া দেবেন না। খানিক বোমা ফুরোক, একটু ভাটা পড়ুক।

—বোমা কি কমবে ?

—পুলিশ মরলে তখন ?

—সব সময়ে মারে, মরতে পারে হয়তো। কিন্তু পুলিশ আসছে, এতেই কাজ হবে।

—অভীকবাবু কি বলতে এলেন ?

—ওই একই কথা। তিন নম্বরের একটা ভালমত ফয়সালা হওয়া দরকার।

তপন বলে, হবে না।

অভীক কথা বলে ও. সি.-কে, উত্তরটা দেয় তপন। এবার অভীক তপনকেই বলে।

—হলে কারো অসুবিধে আছে ?

অভীক প্রশ্ন করে, কিন্তু তপন ও. সি.-র দিকে চেয়ে কথা বলে।

গজু আর রঙিন, দুজন থাকতে হবে না। কিন্তু আপনি যান গাড়ি নিয়ে, কখন যাবেন আর ?

অভীক নীরব চোখে তপনকে দেখে।

—হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি যান। দেখছেন না কখন থেকে এরা এসে বসে আছে।

অভীক বলে, এরা কারা ?

—বাঁদরঅলা, ভিখিরি, ওদেরও তো বাস রেললাইনের ধারে।

ও. সি. মনে মনে নোট করেন ব্যাপারটা। তাঁকে মাঝখানে রেখে অভীক আর তপন বেশ কথাবার্তা চালাল। অভীক আর তপন ? হিসেবটা মিলছে না কেন ? তিনি তপনের দিকে চেয়ে কথা বলেন।

—হ্যাঁ, বেরোই ? জীপ একটা, ড্রাইভারের ক্রনিক আমাশা, থানার ফোর্স বা কত !

ও. সি. বেরিয়ে যান।

তপন বলে, যান। ওদিকে ফয়সলা ওরা একটা কিছু করে ফেলেছে।

অভীক জানে অনুচিত কাজ করছে। তবু বলে, কি ফয়সালা ?

তপন নিস্পৃহকন্ঠে বলে, এ-ওকে, নয় ও-একে মারবে। নইলে তো থামবে না।

—তাহলে থামবে ?

—যতদিন না আরেকজন উঠে আসে।

—ওখানে ফাঁড়ি দরকার।

—সুধীনবাবু, লালটুবাবুকে বলুন না।

তপন বেরিয়ে আসে। অভীকের সঙ্গে কথা বলছে খুব রুক্ষ গলায়। ওরা আলাদা, তপন আলাদা। দুজনে দুজনকে চেনে না এমন নয়। কিন্তু এখন আর কথা বলাও সম্ভব নয়। অভীক এত নির্বোধ কেন ? তপনের সঙ্গে কেন কথা বলছে ?

গাড়িতে টাইগার ছিল। তপন বলল, বরবার, বলে এলাম। যারা পালিয়ে এসেছে তাদের আবার না ধরে পুলিশ। বসছি যান, যান। বেটা নড়তেই চায় না।

—কি দরকার দৌড়বার, দাদা? দুটোর একটা যাবে, তবে তো শান্তি হবে।

তপনের কোম্পানির আপিসের গাড়িবারান্দায় লোকগুলি যেন জেনেই গিয়েছে যে আজ রাতে আর ফেরা হবে না। পরা পাউরুটি কিনে এনে খাচ্ছে, কল থেকে জল খেয়ে আসছে।

কুশ বলে, তুলে দেব?

কি দরকার? সকাল হলে চলে যাবে।

বাঁদরঅলা, বাঁদর, ভিখারি, আরো কিছু মানুষের জমায়েত। ওর মধ্যে একটা ছোট মেয়েকে পাউরুটি খেতে দেখে তপন বলে, এই তুই পাপিয়ার মেয়ে না?

মেয়েটা কথা বলে না।

বাঁদরঅলা বলে, বিকেলে ওকে রেখে গেল ওর মা। দুটো টাকা দিয়ে গেল। বলল, ওকে রাখো তোমার কাছে। সেই তো বলল, হাল্লা আসছে, তোমরা পালাও।

—ও, বিকেলে রেখে গেল?

একটি বৃদ্ধা, রোজই টাউনে ভিক্ষে করতে আসে, সে বলল, মণির মা-ই তো কোমরে কাপড় জইড়ে, চুল উইড়ে চীচ্‌কার করে বলতে বলতে গেল, পাইলে যাও গো, ভীষণ হাংনামা আসচে।

—সে পালাল না কেন?

—ঝানিনি বাপ। আমরা টেশনে পাইলে এলাম, তাতে সবাই বলল, হেতা আসতে। তাতেই···কোনোমতে···

—এসেছ, থাকো। কুশ, গেটের ফটক বন্ধ করে চাবি বন্ধ করে দে। দরকার হলে ডাকবি, জেগে আছি। চল্‌ টাইগার, মাননীয় অতিথিদের দেখি।

আউট-হাউসের ওপরের ঘরে জানলা-দরজা বন্ধ করে গেস্ট-হাউসে বসেছিলেন সেইন ও আনন্দ।

তপন বলল, দরজা খুলুন। আমি তপন।

দরজা খুলল ওরা। আনন্দ বলল, শুকুবাবু বলে গেছেন সব

বন্ধ করে থাকতে।

—কেন, বিপদ হবে?

—তাই তো বলল।

—কোথায় বিপদ! সে তো দিব্যি এই অন্ধকারেই বাড়ি চলে গেল। আপনারা খেয়েছেন?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, সে সব ব্যবস্থা···

—জানলা বন্ধ করেছেন কেন? এই বন্ধ ঘরে ঘুমোবেন কি করে?

—যা শব্দ আসছে···!

তপন এগিয়ে যায়, তাকায়। একটু দাঁড়ায়।

—না, থেমে গেছে।

—একেবারে হঠাৎ এ রকম···

—এখানে কিছু হবে না। শুয়ে পড়ুন।

—আজই ওখান দিয়ে এলাম···কি পীসফুল লাগছিল। ওখানে সানসেট এত বিউটিফুল···

—বেঁচে গেছেন। শুরুটা তখনি হয়। ভাববেন না, পুলিশ চলে গেছে।

—ওই তিন নম্বর জায়গাটা···

—সবাই তো সমাজবিরোধী নয়। যাক গে, শুয়ে পড়ুন। *এখানে আপনারা নিরাপদ।*

সেদিন কি তপনই জানে যে সমাজবিরোধিতা আর তিন নম্বরে কেন্দ্রীভূত রাখার দরকার থাকবে না। রাজ্যের প্রতি বড় ও ছোট শহরের, ভারতের সর্বত্র, তিন নম্বরগুলো ধূলিসাৎ করে ঝকঝকে রাস্তা বা অভিজাত বাড়ি বানিয়ে দিলেও সমাজবিরোধিতা বন্ধ করা যাবে না। দিকে দিকে, সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সমাজবিরোধিতা ছড়িয়ে পড়বে। অনেক জাতের সমাজবিরোধী আসবে, যারা সবাই বোমবাজি করে না, পাপিয়াকে সিঁদুর পরায় না বারবার, তারাই নানারকম জাতের কাজকর্ম দিয়ে সমাজের ভিতের তলাটা খুঁড়ে খুঁড়ে ধসিয়ে দেবে।

ভবিষ্যৎ দেখা যায় না।

পরদিন সকালে সাতটা নাগাদ টাউনে ছড়িয়ে পড়ে খবর। গজু

যখন কালোকে মেরে জেলে যায়, তখন কালোর কয়েক হাজার টাকাও উধাও হয়েছিল। সে টাকার হদিসও পাওয়া যায়নি।

গজু জগদ্দলে ওর বিশ্বাসী লোক হবিবের কাছে দুদিন ধরেই ছিল। হবিব ওকে আরো কিছু বিশ্বাসী লোক দিয়ে দেয়। গজু হবিবের কাছে টাকা নিয়ে থাকবে, সে টাকা বন্ধু কর্তৃক দান, না ধার, না গজুর রেখে যাওয়া টাকা, সে কথা কেউ জানে না। গজু বোমা ইত্যাদি খরিদ করে, রিভলভারও একটি।

তারপর ও হবিবের লোকজন নিয়ে এসে পড়ে।

কুশ এ পর্যন্ত বলে কপাল মোছে।

—পাপিয়া জানল কি করে যে সে আসছে?

—সে তো সকলেই জানে।

—তবু পালাল না?

—সকাল থেকে রঙিনকে ঠেলছে, বেরোও বেরোও বলে। সে লোক সে কথা শুনল একবারও? তারপর বলে, বেরোতে হলে তোকে আর তোর মেয়েকে কেটে রেখে তবে যাব। তখনি ও কেমন করে মেয়েটাকে ছিনিয়ে এনে পালায়। মেয়েকে রেখে এসে পাড়ায় চেঁচিয়ে সাবধান করতে করতে আসে। ফকির বলছে, যেন পাগল হয়ে গিয়েছিল। তারপর বঁটি তুলে রঙিনকে তেড়ে যায়। ওর পায়েও মেরেছিল, কিন্তু শেষরক্ষে তো হলো না।

না, শেষরক্ষা হয়নি। পুলিশের গুলিতে ছত্রভঙ্গ হয়ে পালায় বটে ওরা, তবে বোমা ছুঁড়তে ছুঁড়তে।

—ক'জন মরল?

—পুলিশ লাশ আনছে।

—পুলিশের গুলিতে কেউ মরল?

ও. সি. ভাল লোককে ফেলেছে। জগৎকে মনে আছে? দীনুবাবু তাড়িয়েছিল? কে জানত সে জগদ্দলে বসে আছে। জগৎ পড়ে গেছে। হবিবের কাছে এতদিন!

—নিচে চল্ তো।

নিচে গিয়ে তপন ওদের বলে, সকাল হয়েছে, তবু এখনি যেও না।

কাফর্‌্‌, তিন নম্বরে কাফর্‌্‌। সন্ধ্যা থেকে ভোর। এস. ডি ও. এসে পড়েন। আর দশটা নাগাদ ট্রাকে পাঁচটি দেহ এসে পড়ে রঙিন, গজ্‌, জগৎ, রঙিনের ডান হাত ফেলন, আর পাপিয়া পাপিয়া গুলিতে ছিন্নভিন্ন। থানাতে লোক ভেঙে পড়ে।

বোমা ও যথেচ্ছ গুলি বিনিময়ে জোর জখম এগারোজন হাসপাতালে ভর্তি হয় পুলিশ পাহারায়। এ ছাড়াও বেশ কিছু ধরা পড়ে।

ও. সি ফোন করেন।

—পাপিয়া সিং-এর মেয়েটা আপনার ওখানে?

—তাকে কি দরকার?

—সনাক্ত করার জন্যে চাই না?

—না, চাই না। তিন নম্বরে সবাই ওদের চেনে। একটা ছোট মেয়েকে ও দৃশ্য দেখাতে হবে না। দরকারই বা কি?

—ওখানে যারা বসে আছে, তারা কিছু জানতে পারে।

—তারা বিকেল শেষ না হতে পালিয়ে এসেছিল। ওখানে কি হয়েছে তা ওখানকার সবাই জানবে। কিন্তু আপনারা কোনো খবর রাখেননি যে এরকম ঘটতে চলেছে।

ও. সি. হাসেন।

—পুলিশ খবর রাখে না সেটা সত্যি নয় তপনবাবু। খবর রাখলেও সব সময়ে অ্যাকশান নিতে পারে না পুলিশ। আর, বিকেলে ওরা আপনার কাছে এল…

—বিকেলে নয়, সন্ধ্যে গড়িয়ে। আমি তো তারপরেই গেছি আপনার কাছে।

—হ্যাঁ…জগৎ…ফেলন…রঙিন…গজ্‌…চারটে সমাজবিরোধী তো গেল।

—তা গেল। পাপিয়াও।

—শী ওয়াজ এ হার্ড ক্যারেকটার।

—জানি। আচ্ছা, ছেড়ে দিলাম।

টাইগার বলল, ভাবচ কেন? পাপিয়া, পাপিয়া বলচ, কিন্তু আগে যদি গজুকে বে' করে, পরে রঙিনকে, সে মেয়ে তো মরবেই।

—নিজের মেয়েটাকে বাঁচিয়ে গেল।

—ভাসিয়ে গেল বলো। এখন ওকে দেখবে কে?

—পুলিশ দেখুক। অনাথাশ্রমে দিয়ে দিক।

—ওর ঘরদোরের কি হবে?

—যা হয় হবে। তুমি ভাবচ কেন?

বাঁদরঅলাটি বলল, থাকবে কোথায় ওখানে? আমাদের কাছে যে রাখব, সবাই তো জানবে কার মেয়ে, তখন এসে হামলা করবে কেউ।

—ওর ওপর?

—বাড়িটা আছে না?

তপন বোঝে টাইগারের কথাই ঠিক। পুলিশই পারে ব্যবস্থা করতে।

—ও. সি. বললেন, মেয়ে সন্তান তো! দেখবেন কোনো ব্যবস্থা হয়েই যাবে। আমরা কি করতে পারি বলুন। এস. ডি. ও লিখে দিলে অরফানেজে অনুরোধ করতে পারি। যাবে তো শিবতলা অরফানেজে। সেখানে মেয়েদের ভাল কিছু হতে দেখিনি। কেন হবে বলুন? সরকারী গ্রান্টে চলে···অর্থারিটি খুব ইনডিফারেন্ট! খাওয়া-দাওয়া থাকা-শোওয়া জামা-কাপড়ের যে হাল সে দেখলে বুঝবেন, কান্না পাবে।

—কোথাও কোনো ভাল ব্যবস্থা নেই?

—কোথায় আর? আমি তো জানি না।

—এখন নয় ওদের কাছেই থাকুক। আপনি কোনো খোঁজ পেলে জানাবেন, দিয়ে যাবে ওরা।

—আপনি সত্যি আজব মানুষ! কোথাকার কে, তার মেয়ের জন্যে ভাবছেন?

কি করা যাবে বলুন?

—যার মেয়ে, ও মেয়েও ক্রিমিনালই হবে।

—হিন্দী সিনেমাতেও তাই দেখায় বটে। সে রকম হতেই পারে, হয়ও না। দীনুবাবুর ভাইরা অন্যরকম। ছেলে তো একেবারে অন্যরকম।

ও সি. মাথা নাড়েন।

ওগুলো ব্যতিক্রম। আমার অভিজ্ঞতা কিন্তু অন্যরকম।

চোর, বজ্জাত, বদমাশ নিয়ে কাজ করতে করতে হয়তো মনটা অবিশ্বাসী হয়ে গেছে। হিন্দী ফিলিমে কিন্তু অনেক সত্যি জিনিস থাকে।

—তা হবে। মনে রাখবেন একটু।

—আপনি বললেন, মনে রাখব না ?

কয়েকদিন বাদে ও. সি. বলল, নিন, আপনাকে মুক্তি দিয়ে গেল মেয়েটা।

—তার মানে ?

রীতিমত রাউন্ডে যাচ্ছি, পুলিশ পোস্টিং অবশ্য টেম্পোরারি। জানি না কর্তারা কি করবেন। পার্মানেন্ট আউটপোস্ট না হলে অসম্ভবই।

—মেয়েটার কি হলো ?

—ও তো বাঁদরঅলা আর বুড়ি, ওদের কাছেই থাকছিল। আজ দেখি কেউ নেই। পানঅলা বলল, আজ খুব ভোরে ওরা চলে গেছে। গেছে মানে পুরো গ্রাউডটাই গেছে।

- চলে গেল !

- হ্যাঁ মশাই, মেয়ে সন্তান, বিক্রিও হয়। কলকাতায়, আশপাশে কত রকম যে হয় তার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। মেয়ের মার্কেট খুব ভাল।

—এতো ছোট মেয়ে।

—ভিক্ষে করতে ভাল। লাইনের ম্যাডামরাও শিখিয়ে পড়িয়ে বড় করতে পারে। ব্যবসা এখন খুব বাড়বাড়ন্ত।

টাইগারের কথা। নো ইনভেস্‌মেন্ট। অল প্রফিট, এনে ফেললেই হলো।

তপন গুম হয়ে যায়। টাইগার বলে, নিয়তি, নিয়তি। যার কপালে যা আচে তা তুমি ঠেকাবে কি করে ? ভেব না, চল তোমাকে ঘুরিয়ে আনি।

—ভাল লাগছে না।

—রঙিন তো মরণ ডাকছিল।

—ভবানীবাবুর সঙ্গে কথা বলা দরকার।

—শুনচি আসবে।

—এলেই ভাল।

ভবানীবাবু নতুন গাড়িতে রেণু বউদিকে নিয়ে আসে। রেণু বউদি সংকটা কালীর পুজো দেবে। টাইগার বলে, সোনার চাঁদ ছোট জামাই তো হোটেলের ব্যবসায় নেমেছে। সমানে টাকা চেয়ে যাচ্ছে, পুরীতে ফ্যাশানী হোটেল করা কি সোজা টাকার ধাক্কা ? টাকা দাও, নইলে মেয়ে নিয়ে যাও।

- টাকা দিচ্ছে এরা ?

—কেন দেবে না। ধুলোমুটো সোনামুটো হচ্ছে ?

ঢাকাই বেনারসী ও সোনার গয়না পরে রেণু বউদি পুজো দিয়ে আসে। সোনার জবাফুল ও মায়ের নথ দিয়েছে, মনস্কামনা পূর্ণ হতেই হবে।

গেস্ট হাউসের ঘর খুলে দেওয়া হয়। রেণু বউদি গড়িয়ে পড়েন ডানলোপিলোতে।

—আমি খাব না দাব না, কিচু করব না।

ভাবানীবাবু বলে, লালটু নেমন্তন্ন করেচে, যাবে ?

- মা গো ! মাচ-মাংসের ছিষ্টি।

—তোমার জন্যে আলাদা ব্যবস্থা থাকবে।

-কি পিচাশ বাপ, বাবা ! চা-বাগান, হেনতেন, তুই পারিস না ছেলেকে হোটেল করে দিতে ?

—বকো না তো ? সবই তো ওদের। পরে দেবে, আগে দিচ্চ। আমি কাতর হচ্চি ?

—কি অপমান করে না চিটি দিচ্চে ! না জানি আমার বোবি কত কষ্ট পাচ্চে !

—তার কষ্ট কোতা দেকচ ? হোটেল তার নামে হবে। দুজনে চালাবে। না, লাইন ভাল ধরেচে। রেশপেকটেবল বিজিনেস। এর সম্ভাবনা আচে। বাঙালী হোটেলের বিজিনেসে না ঢুকলে পাঞ্জাবীরা খেয়ে নেবে লাইনটা। যাগ গে, তুমি বিশ্রাম করো। আমার কাজের কতাগুলো সেরে নিই। মেয়ের কষ্ট দেকচ ? মেয়ে বরের সঙ্গে কোতা কোতা বেড়াচ্চে, কত আনন্দে আচে, তা দেকচ না।

—দেবীর শ্বশুর কি ছেড়ে দেবে ?

- দেবে, তাকেও দেবে। মেয়েদের দেবে না, কাকে দেবে? আর আছে কেউ? চুপ করে শুয়ে থাকো।

ভবানীবাবু বেরিয়ে এসে বলে, মায়ের মন তো! কেঁদে কেঁদে একেবারে শেষ হচ্চে। আমি আবার মেয়েছেলের চোকের জল সইতে পারি না।

দীনুবাবুর বাসভবন থেকে আউট-হাউস এখন মোরামের পথ। দুপাশে ফুলের গাছ। পাঁচিলের ভেতর, গেটের ধারে দারোয়ানের ঘর। পাঁচিলের গা দিয়ে সার সার গাছ। একটি কাঁটাতারে ঘেরা ছোট বাগানে গাঁদা, জবা, দোপাটি, শিউলি। ও বাগানে প্রবেশ নিষেধ। ও বাগান থেকে মোহনলালবাবুর বাড়ি পুজোর ফুল যায়।

অফিস ঘরের পিছনে বসার ঘরে বসেছিল তপন। বুশ শার্ট ও প্যান্ট, ওর অভ্যস্ত পোশাক। চেহারাটা আরো বলিষ্ঠ হয়েছে, কোথায় যেন কি পালটে গেছে ভবানীবাবুর মনে হয়। চোখের চাহনিটা যেন উগ্র হয়ে গেছে।

- সবই শুনলাম। খুব জঘন্য সব ব্যাপার।

তপন চেয়ে থাকে।

- পুলিশ পাহারা দিচ্ছে।

তপন চেয়ে থাকে।

—রঙিন চিরকালই মাথাগরম।

তপন চেয়ে থাকে।

- তুমি মোটে বলচ না কিছু?

—আপনার বলা হয়ে যাক।

- আমি···বলছি···

—তাহলে আমি বলি।

তপন হেলান দেয়। ভবানীবাবুর সামনেই সিগারেট ধরায়। তারপর বলল, নেক্‌সাস্‌। কথাটা নতুন শিখেছি।

—মানেটা আমি জানি তপন।

—একসময়ে আপনি আর দীনুবাবু। তারপর এখন আপনি, সুধীনবাবু, লালটুবাবু, মোহনলাল, আপনার সেই সব সিমেন্ট-লোহা-বেল কন্ট্রাক্টররা, টাইগার, সব মিলেমিশে আরেক রকম

নেকসাস্। নেক্সাসের পেছনে তো কোনো ঝান্ডার ব্যাপার নেই, থাকেও না। ঝান্ডা অবশ্য কাজে লাগানো যায়, আসল ব্যাপার ফায়দা, না কি বলেন ?

— বেশি কড়া কথা বলো না তপন। আজ নানা কারণে আমার মনটা খারাপ হয়ে আছে।

থাকতেই পারে, থাকতেই পারে। রেণু বউদির ছোটজামাই প্যাঁচ কষছে, মন ভাল থাকার কথা নয়। কিন্তু এসব কথা আপনার-আমার স্বার্থেই বলা দরকার। অর্থাৎ বর্তমান নেক্সাসের স্বার্থে।

—বলো। শুধু ধমকে বলো না।

—না, ধমকাব কেন ? আপনি আমাকে এত দিচ্ছেন! যা হোক, তেরঙা ঝান্ডা সামনে রেখে আপনি, দীনুবাবু, মোহনলাল-বাবু অপারেট করতেন, টাউনের লোকদের পক্ষে বোঝা সহজ ছিল। এই পার্টি গুন্ডাও পোষে। তাদেরকে ঘেন্না করো, ভয় পাও। সুধীনবাবু, লালটুবাবু তখন আপনাদের বিরোধী। আপনারাও। দীনুবাবু তো বস্তাপচা সব আদ্যিকেলে কথা বলত। ওরা সে সময়ে বেয়াল্লিশের আন্দোলনে সামিল হয়নি, নেতাজীর নামে কুৎসা করেছে, স্বাধীনতার পর স্লোগান মেরেছে, এ আজাদী ঝুটা হ্যায়। হ্যাঁ, তপন টাউন জানত, এরা সরকার পক্ষের, এরা নয়। নেক্সাস্ চেনা সহজ ছিল।

—এ সব কথার দরকার কি ?

দরকার হতো না, যদি আপনি আমাকে এখানে না আনতেন। আপনার জন্যে আমি অ্যাকশান করে যাব, যেদিন সুবিধে হবে, আপনি আমায় ধরিয়ে দেবেন···

— তুমি একন ক্লোজ ফ্রেন্ড তপন।

—কি বকছেন যা তা ? আমার আপনার সম্পর্ক দুটো সাপের মতন। কেউ কাউকে বিশ্বাস করি না। পারলেই বুঝিয়ে দেব কার বিষ বেশি। যাক গে, এই টাউন। টাউনে সবাই তো বিক্রি হয়ে যায়নি। তারা বর্তমান নেক্সাস্ দেখে বিভ্রান্ত। যারা ছিল বিরোধী, তারা রাজনীতিতে বিরোধী রয়ে গেল। মোহনলালবাবু কংরেসী, আপনিও মার্কামারা। কিন্তু এ বিরোধিতা কিছুদূর অবধি। ফায়দা ওঠে এমন কারবারে খুব ঐক্য।

—এটা টিকে থাকার নীতি তপন। হরদম হচ্ছে।

—কিন্তু টাউন যে বিভ্রান্ত !

—বক্তৃতা হয়ে গেল ?

—না, আসল কথায় আসছি। এখন আপনি গুডউইল চান, চান তো ?

—চাই।

তাহলে চুল্লু কারবার রাখা চলে না। ব্যারাকবাড়ি রাখা চলে না। বিজিনেসে নেমেছেন, বিজনেস করুন। এখন আর ও সবে দরকার কি ? প্রোজেক্ট তো আপনাদের অনেক রকম। এ সব ছেলেদের তাতে নিয়ে নিন। টাইগার খুব ধারাল ছেলে। ও যে কোনো কাজ করতে পারবে।

—হ্যাঁ···তিন নম্বরের ব্যাপারটা···তুমি তো যাওনি।

—গেলে কি ঠেকাতাম ? রঙিনকে বারবার বলা হয়েছিল, ও কারো কথাই শোনেনি।

—তুমি তো একটা গুডউইল করোচো।

—মার্ডারারকে সবাই ভয় পায়।

—ভাবব, ভেবে দেকব।

—তাড়াতাড়ি ভাববেন। আর, লেবার কাজে লোকাল লোক নেব আমরা। বুঝতে পারছেন নিশ্চই, আপনার ভাল ছাড়া কিছু ভাবছি না।

একন টাইগার আছে বটে, কিন্তু ব্যারাকবাড়ি বহুদিনের। যকন সায়েব কোম্পানি আশপাশে মিলমালিক, তকনের। আর হঠাৎ যে বন্দ করবে, ওরা যাবে কোতায় ?

—টাইগার ডিজার্ভস বেটার। ওটা তো ওখানে যে মহিলা আছেন, তিনিই চালাতে পারেন। মালিকানা নয় আপনার থাকল।

—ভেবে দেকব। তুমি নীতিবাগীশ, সে ভাল। কিন্তু ক্রমে এ ব্যবসা ঘরেদোরে ঢুকে যাবে। টাইম পাল্টাচে তপন। টাইম অন্যরকম হয়ে যাচে, হতেই হবে।

—সময় আরো খারাপ হবে ?

—আমার মতো চারশো বিশ আরো তৈরি হবে। কাঁচা টাকা আসবে, কোরাপশান ছড়াবে, তখন দেকবে ইনডিয়াতে বড় বড় ভবানী

আর বড় বড় তপনের খেলা। সময় পাল্টাবে।

—হয়তো।

—পাঁচজন দুঃখে না থাকলে একজন সুখে থাকে না তপন, গোদা কতা। চুল্লুর নেশা যাদের, তারা খাবেই। এদের বন্দ করো, অন্যরা এসে ভাটি খুলবে। গাঁ-গেরামে ঢুকে যাবে। তবে হ্যাঁ, টাইগারকে বলব যে তুমি তার কতা ভাবো।

—রঙিনের বাড়ির কেউ নেই ?

—আচে। তারা ওকে বাদ দিয়েচে বহুদিন আগে। চিরকাল গোঁয়াতুমি করেই গেল। আশ্চজ্জ ! এ লাইনে কেউ কারো কতা ভাবে না, তুমি···ওকে অত বিশ্বাস কোর না।

—আমি আবারও বলছি, ওর ওপর বেটার জাস্টিস করুন। ওর বাড়ি আছে, বাড়ি বলে টান আছে।

—পোকিত টান থাকলে লাইনে আসত ?

—আর আপনারা, তিন নম্বর সম্পর্কে একটা স্থায়ী ডিসিশান নিন, এস. ডি. ও.-কে বলুন, থানাকে বলুন।

—বলব ওদেরকে। পলিটিসের কতা ভাবো ?

—কি ভাবব ?

—টিকতে হলে তো একটা দলের সঙ্গে থাকতে হবে।

—মাপ করবেন, আমি কারো কাছে যাব না।

টাইগার বলল, মরদ কা বাত ! আসলে তোমার একটা পপুলারিটি এসে যাচ্ছে, তাতেই এরা চিন্তিত।

—তোমার বিষয়ে এ সব কথা কিন্তু বলেছি।

- অনেক থ্যাংস দাদা। হলে একটু ইজ্জত পাব। দেকলে তো, দীনুবাবু ইরানী, সেদিনে রঙিন, গজু, এতগুলো লোক মরল, সবাই বলে, পাপ বিদেয় হলো। শুধু নোংরা কারবারে থাকলে আর চেম্বার চালালে কোনো ইজ্জত থাকে না।

—আমি মরলে সবাই বাজনা বাজাবে।

মরবে বা কেন ? আর, একন যে শাকউলি, মাচঅলা, গামচা দোকানি, সবাই বলে, তপনবাবু এল বলে শান্তিতে কারবার করচি।

—হরিজনরা কোনোদিন বলবে না।

—না, চুল্লুর ঠেক তুলে দেয়াতে অনেকেই খুশি। তবে ভরতের ব্যাপারে দুঃখ তো থাকবেই।

হ্যাঁ···থাকবে।

তপন চুপ করে যায়।

—বাড়ি একেবারে যাও না ?

অনেকদিন যাইনি। হঠাৎ এ প্রশ্ন ?

—বাড়ি গেলে তোমার মুডটা অন্যরকম থাকে নইলে গুম মেরে যাও।

—ভবানীবাবুরা চলে গেছে ?

—কাল সকালে যাবে। আজ তো মিটিং করবে লালটুবাবুর বাড়ি। বলল, তিন নম্বর নিয়ে কি সব বলবে, টাউন পরিষ্কার করবে। আসলে খুচরোদের হটাবে, যা বুঝলাম।

—দেখাই যাক। পাপিয়ার মেয়েটাকে বাঁচানো গেল না। কি যে হলো !

—কে কাকে বাঁচায় দাদা ? তুমি কি ভগবান ?

—ভগবান, তুমি ভগবান !

কাঁদছিল মেয়েটি, মাথা ঠুকছিল বারবার। বয়স বছর বাইশ হবে। ছোট চোখ, ঠোঁট খুব পুরুন্ত, চুলগুলো সিঁথি উলটে আঁট করে জড়ানো। ছাপা শাড়ি, হাওয়াই চটি, নাইলনের একটা জালি ব্যাগ জাপটে ধরে আছে।

—তুমি ভগবান, আমাকে বাঁচাও।

সবুজ একটু তফাতে দাঁড়িয়ে, অন্যদিকে চেয়ে আছে। তপন ধমকে ওঠে, কান্না থামাও। পরিষ্কার করে কথা বলো। সবুজ, এ কে ? নাম কি আপনার ?

—রাধা···কর্মকার···

—বাড়ি কোথায় ?

মেয়েটি আবার কেঁদে ওঠে।

সবুজ বলে, কুসুমপুর ছাড়িয়ে তেঁানবাগে।

তেঁানবাগ ! যেখানে উৎকৃষ্ট হাতপাখা আর খেজুরপাতার নকশীপাটি তৈরি হতো ! নানা ডিজাইনের হাতপাখা। বিয়ের

তত্ত্বে যে পাখা সাজিয়ে দেওয়া হতো। খেজুরপাতার নকশীপাটি নানা রঙা, তা একবার শিল্প-প্রদর্শনীতে পুরস্কার পেয়েছিল। তপনরা তেঁনিবাগে খেজুররস খেতে যেত। কয়েক ঘর কর্মকার। গ্রাম-জীবনে কামারদের কাজের গুরুত্ব খুব। তেঁনিবাগের কামাররা বেশ সঙ্গতিপন্ন ছিল। তেঁনিবাগ শিক্ষায় অগ্রণী গ্রামও বটে। বেশ কিছু গ্রাজুয়েট ও হাইস্কুল-পাশ ছেলেমেয়ে আছে ও গ্রামের। অপূর্ব কর্মকার ব্যাঙ্কেও ঢুকেছিল।

—তেঁনিবাগে বাড়ি, এখানে কি করছেন?

সবুজ বলে, তুমি ওধারে যেয়ে বসো, আমি বলছি।

মেয়েটি গিয়ে সিঁড়িতে বসে। চোখ মুছে বারবার তাকায়, যেন তপন ওর ভাগ্যবিচারক।

সবুজ নিচুগলায় বলে, মেয়েটা ভাল। বাপ নেই দাদা তেমন মন দিয়ে কাজ করে না, অভাবী সংসার।

—অভাবের জন্যে আসেনি সবুজ, সত্যি কথা বলো।

—একটা ছেলের সঙ্গে ভাবভালবাসা হয়েছিল…

—এতখানি বয়স, ওর বিয়ে হয়নি?

মেয়েটি সরু গলায় বলে, হয়েছিল…নেয় না।

—কোথায় বিয়ে হয়েছিল?

—নবলেতে।

—কবে?

—সাত বছর আগে।

—সেখানে ক'দিন ছিলে?

—আট দিনের দিন ধুলো-পা করতে আনল, আর নিয়ে যায়নি গো বাবু।

—তার নাম কি?

—অরুণ সরকার। স্যালো মেশিন চালায়।

—রেখে গেল কেন?

—দাদা…সাইকেল দিতে পারেনি…সোনার বোতামও নয়…

—সেখানে গিয়েছিলে আর?

—সে কবে বিয়ে করেছে বাবু…আর নেবে না।

—এ টাউনে কেন? কোন ছেলে সে? নাম-ঠিকানা কি?

—ইলেকট্রিকের কাজ হচ্ছিল গ্রামে, ক'মাস ধরে···

—অমনি ঝুলে পড়লে ?

—বে' করবে বলেছিল···

মেয়েটির গলা খুব ক্ষীণ হয়ে আসে।

—অমনি বিশ্বাস করেছিলে ?

—গেল এল, দাদাকেও বলল···

—দাদা বিয়ে দিল না ?

—দাদা তো হাত ধুয়ে ফেলে দিয়েছে। দাদার কথা, গাঁয়ে বসে বে' দিলে লোক খাওয়াতে হবে, সমাজে কথা হবে···তাতেই স্বপন বলল···

—নাম স্বপন ?

—বলেছিল স্বপন বিশ্বাস। এই টাউনে বাড়ি, ইলেকট্রিকে কাজ করে। ঠিকানা দিয়েছিল। আমার কাছ হতে দুশো টাকা ধার নিল গত রোববার···

—তুমি দুশো টাকা পেলে কোথায় ?

—আমি তো ধান সেদ্দ করি, ভাপাই···হাঁস-মুরগি করেছিলাম ···টাকা আমার···

—টাউনে আসতে বলেছিল ?

—হ্যাঁ, ঠিকানা দিয়েছিল। বলেছিল, সংকটা কালীমন্দিরে থাকবে, বে' হবে। ও একা থাকে, কোনো অসুবিধে হবে না।

—এসে দেখছ সব ধাপ্পা ?

মেয়েটি আবার কান্নায় ভেঙে পড়ে।

—এখানে এলে কেন ?

—মন্দিরেই দাঁড়িয়ে থাকবে বলেছিল···

—কখন ?

—সকালে। সেই থেকে টাউনে ঘুরে মরছি। সব মিছে কথা, সব। নাম মিছে, সে কাজও করে না, ঠিকানাও মিছে! শেষে ক'জনা বলল, থানা যেয়ে বা কি করবে ? আপনার নাম বলল। বলল, তিনি কিছু করতে পারবে।

—আমি কি করব ?

—এই তার ফটো বাবু, লোকে বলচে সে এ টাউনেই কোথা

থাকে। তার নাম আলোক মন্ডল।

ছবিটা দেখে তপন। বলে, থাকুক, পাত্তা লাগাব। তা, তুমি গ্রামে ফিরে যেতে পার না?

—দাদা কেটে ফেলবে।

যাবার কোনো জায়গা নেই?

—রেলে মাথা দেব, আর কোথা যাব?

সবুজকে পাশে ডাকে তপন। বলে, আজকের মতো কোথায় রাখা যায় মেয়েটাকে? তোদের বাড়ি?

মা ঢুকতে দেবে না।

—আমাদের বাড়ি নিয়ে যা। মাকে বলবি, একটা রাত যেন রাখে।

—তারপর?

মলয় বেশ কিছুদিন টাউনে নেই, তাই না?

—সে তো কলকাতায় বসে আছে।

—ছবিটা দেখ্। গোঁপ কামালে মলয় না?

না না, কপালে কাটা দাগ কোথায়?

তাও তো বটে। যাক, নিয়ে যা এখন। মাকে বলবি, কোনো কথা শুধোবে না। তুমি এর সঙ্গে যাও এখন। কাল থানায় ডায়েরি করবে।

পুলিশে দেবেন আমায়?

—পুলিশে লেখানো দরকার। তোমার দিক থেকে একটা অভিযোগ থাকুক। এখন এর সঙ্গে যাও।

—আমাকে দয়া করে দাদার কাছে পাঠাবেন না। দাদাকে আপনি জানেন না, আমাকে মেরে ফেলবে।

সবুজের সঙ্গে যাও। কোনো কথাবার্তা বলবে না, চুপচাপ থেকো। সবুজ, মাকে বলিস, আসব আজ। একবার থানা ঘুরে আসি।

থানার ও. সি. বলেন, ছবিটা দেখান দেখি। এ রকম কেস হরদম হচ্ছে এখন।

ছবিটা দেখে বলেন, চেনা গেল না। তবে ইলেকট্রিসিটি বোর্ড তো জানবে।

—ওদের ওখানে কাজ করে না।

—এ সব কাজ কন্ট্রাকটার করে। কন্ট্রাকটার কাকে কখন নিচ্ছে, কাজ করাচ্ছে, তাদেরও লেবার ঠিকাদার থাকে। যাক গে, কেসটা কি?

তপন বলে যায়।

—থানায় আনলেই পারতেন। এ সব মালকে কেউ বাড়ি নিয়ে যায়?

—থানায় মেয়েছেলে থাকবে কোথায়?

—কোথায় আর, লকাপে।

—তারপর কি হয়, সেও তো আপনার জানা।

—সত্যি, খুব সত্যি। তবে সব সময়ে নয়।

—দেখুন, লকাপে ধর্ষণ, এখানে আগে হয়েছে।

—হ্যাঁ, খানিক লিখেছে লোকাল কাগজ। তীর্থবাবুরা দল বেঁধে চেঁচিয়েছে। নন্দিতা দত্ত তার মহিলা সমিতির তরফে বিচারবিভাগীয় তদন্ত দাবি করেছে।

—হ্যাঁ নমিতা নাম ছিল মেয়েটার।

—অ্যান্ড হু ওয়াজ শী? এ কমফার্মড প্রসটিটিউট। বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে রোজগার করত, অন্য টাউনে যেত।

—তাতে ধর্ষণ জাস্টিফায়েড হয় না?

—না, কখনোই না। ডিপার্টমেন্ট ব্যবস্থা নিয়েছিল। যে রেপ করেছিল, তার সাসপেনশান হয়, বদলিও হয়। মেয়েটার কি হয় জানতে চাইলেন না?

—কি হয়?

—লিলুয়া রেসকিউ হোমে পাঠানো হয়। সেখান থেকে পালায়। আবার লাইনেরই নেমে গেছে। এ সব মেয়েদের ভাল করা যায় না।

—লিলুয়া হোমও তো বীভৎস!

—সেগুলো সরকার দেখুক! মেয়েটাকে পাঠাবেন ও যেন একটা ডায়েরি করে যায়। থানার হালও দেখুন। মেয়েদের রাখবার ব্যবস্থার কি হাল! আর কি জানেন, এখন সব জায়গায় দারিদ্র্য, নানা প্রলোভন। এ লাইনে ইজি মানি, মেয়েরা চলে

আসছে।

—হ্যাঁ, আসে।

—আসবে না? গ্রামেও তো মানুষ লোভী হয়ে উঠেছে। এমনও আমি জানি, বউ এ কাজ করে টাকা কামায়, স্বামী তা জানে। তবু মেনে নিচ্ছে!

—এ বলছে, বিয়ের প্রলোভনে ফেঁসে গেছে।

—এ তো এখন আখছার। বিহার থেকে বিয়ে করতে আসছে। অভিভাবককে টাকা দিয়ে খচরাপাতি দিয়ে বিয়ে করছে। তারপর বেচে দিচ্ছে ব্রথেলে।

—কোথায়?

– কলকাতা, পাটনা, বম্বে, দিল্লী, কোথায় নয়? মেয়ে নিয়ে ব্যবসা দেখবেন বেড়েই যাবে। বম্বের দিক থেকে গাল্‌ফ কান্ট্রিতেও পাঠায়।

তপনের মাথায় কোথায় যন্ত্রণা হয়। সমাজকে কি ক্যানসারে ধরেছে? মাথায় চিনচিন করে। যেন অদৃশ্য হেমারেজ হচ্ছে।

ও. সি. আবার বলেন, বর্ডারে কম হচ্ছে? হবে না কেন বলুন? কোনো ইনভেস্টমেন্ট নেই। বেচে দিলেও টাকা। ব্রথেলে তুললেও টাকা। এই একটা কারবারে তো কোনো লোকসান নেই।

হ্যাঁ, টাইগারও একদিন বলেছিল বটে।

—টাউট সর্বত্র। নইলে ব্যারাকবাড়িতে মেয়েরা কোথা থেকে আসে? একবার ঢুকে গেল তো জানে, বেরিয়ে লাভ নেই। পালানো কঠিন হয়। বেরিয়ে গেলেও বাড়িতে ফিরে নেয় না। আবার তাকে লাইনেই নামতে হয়। কিছু কিছু ব্যতিক্রম ঘটে অবশ্য। বেশ্যাকে বিয়ে করে কলকাতায় এক ফল-ব্যবসায়ী বেশ সুখে আছে, এও দেখেছি।

—আচ্ছা, পাঠিয়ে দেব ওকে?

-আপনি আসবেন না। জাস্ট পাঠিয়ে দেবেন। আপনার একটা সুনাম আছে।

—এতেই তো বোঝা যায়, ক্যানসার ধরে ফেলেছে সমাজকে। একটা কুখ্যাত খুনী, তার সুনাম হয়! শিবতোষ দত্ত ছিল, জানেন?

—না। আমি দেখিনি।

—টাউনে তিনটে প্রাইমারি স্কুল করেন। রাস্তা থেকে ছেলে তুলে এনে পড়াতেন। ওই যে রঞ্জনের গ্যারেজ, ওকে মোটর মেকানিক তৈরি করেছিলেন। কি যে অসুখে ধরল, বমি, গায়ে জ্বালা আর জ্বর। ভুগে ভুগেই মারা গেলেন একরকম বিনা চিকিৎসায়। সুনাম হওয়া উচিত ছিল তাঁর। টাউনে তাঁর নামই কেউ করে না। সুনাম! আমার! না, টাউন গলে পচে গেছে। চললাম।

ঘরদোর রং হয়ে গেছে, দেয়ালের যে পুরনো ফাটলটা দেখাত ভারতবর্ষের ম্যাপের মতো, সেও লোপাট। দরজা-জানলায় গ্রীল, মার রান্নাঘরে নতুন কেরোসিন স্টোভ। দেয়াল-আলমারিতে মা কি কি রেখেছে যেন।

আবৃত্তিতে তপনের প্রাইজ "অগ্নিবীণা", "ছাড়পত্র"। তপনের খেলাধুলোয় জেতা ছোট ছোট বিবর্ণ কাপ। সুকু আর বুকু থ্রী লেগেড রানে একটা ছোট শরবত সেট পেয়েছিল। ওদের স্কুল জীবনের বই। তপনের রচনা পুরস্কারে জেতা "চাঁদের পাহাড়"। রেবার পড়ার বই, গানের খাতা। একটা ছবি দেখে তপনের চোখ আটকে যায়।

চার ছেলেমেয়ে নিয়ে বনবিহারীর স্টুডিওতে ফটো তুলিয়েছিল মা। মায়ের আঁচল ধরে রেবা, সুকু ও বুকু দুপাশে, তপন মায়ের পেছনে। মার পরনে ছিল চওড়া সবুজপাড় সাদা শাড়ি। ওরা পরেছিল ঘরে কাচা প্যান্টজামা।

—এ সব রেখেছ কেন মা ?

—দেখি, হাত বোলাই। তোদের কাছে পাই।

—মেয়েটা এসেছে ?

—হ্যাঁ, আমার ঘরেই শুতে দিলাম। মেয়েটা কে রে ? হঠাৎ তোর কাছে ?

—যে যাকে পারে, পাঠায়। আমি কি ভগবান, না এদের সব ব্যবস্থা করতে পারি, তাই বলো ?

—কিছু কাজ তো পেয়েছে। নইলে আসে কেন ? আমাকেই কতজন ধরে।

—কাউকে কিছু কথা দিও না।

--দিই না তো!

--নতুন চশমায় চেহারাটা অন্যরকম দেখাচ্ছে।

—দেখছিও বেশ পরিষ্কার।

চোখের মত জিনিস কেউ অবহেলা করে?

—সবুজও বলল, অন্যরকম দেখাচ্ছে।

- সবুজ সত্যি ভাল ছেলে।

--শ্যামলের মা অবশ্য বলে, সবুজটা জাহান্নমে গেল। কিন্তু তোর সুনাম তো অনেকে করে। তা শুনে সে চুপ করে থাকে। সবুজ বলে, টাউনে চলাফেরায় মেয়েরা কত ভরসা পাচ্ছে দেখ না? সে কিছু বলে না। আসলে শ্যামল যে চলে গেল, সেটা ভুলতে পারে না। সবুজ বলে, তারা ভাল আছে। একটু দাঁড়ালেই তোমাকে নিয়ে যাবে।

—সবুজ ঘরে টাকা দেয়?

—কিছু দেয়, কিছু জমায়। এইটে তো ভাল। আমি বলি, টাকা জমা। কাজে লাগবে।

—ভাল মনে করেছ। শোনো, কালই তোমাকে নিয়ে কলকাতা যাব।

—কেন হঠাৎ?

—তোমার সঙ্গে জয়েন্ট অ্যাকাউন্টে টাকা থাকবে। আমার জানার দরকার নেই। এখন তোমার ছেলেরা জমি কিনুক, বাড়ি করুক। তবে আমার শর্ত, বাড়ি হবে তোমার নামে।

—এ বাড়ি কি হবে?

—বেচে দেব মা।

—বাড়ি তোর বাবার নামে।

—সে-ই নিক টাকা। টাকা টাকা করে বড্ড লালচ ছিল। টাকা দেখেওনি কোনোদিন।

—তারপর?

—তুমি আর বাবা এখানে থাকবে না। তুমি ওখানে আছ, ভাল আছ, এ জানলে আমি শান্তি পাব। টাউন তো অন্য রকম মা। তিন নম্বরের ব্যাপার সহজে মিটবে না। রাণাঘাটে সরে

গেলে আমার মা বলে কেউ তোমার ওপর হামলা করবে না।

—কত টাকা, তপন ?

—অনেক মা। জমিবাড়ির কারবার, টাকা অনেক। চায় তো শ্যামলরা দেখে দিক জমি, তুমি কলকাতার কাছাকাছিও ছোট একটা বাড়ি করতেই পার।

—এত টাকা !

—হ্যাঁ মা। না চাও তো সন্তু বন্তু যে যেখানে আছে বাড়ি করে নিক। ব্যবসার টাকা, আবারও বলছি।

—সে তো পরেও হতে পারে।

—না। আমার জীবনের তো কোনো ভরসা নেই।

—কলকাতায় ব্যাঙ্ক তুই চিনিস ?

—এখানকার ব্যাঙ্ক ইনট্রোডাকশন দেবে। খাতা খুলব। পুরো টাকা ট্রান্সফার করে দেব।

—তুই যা বুঝিস !

—এখানে তোমাদের না থাকাই ভাল।

—তোকে আর দেখতে পাব না ?

—আমি যেতে পারি, তুমি আসতে পার। তবে যেতে আমি চাই না। আমার ছায়া ওদের জীবনে না পড়লেই ভাল। যে যেখানে আছে, ভাল থাকুক। তপনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। এটা সবাই জানে। তাই জানাই ভাল হবে।

—যদি বিয়েও করতিস !

—দীনুবাবুর বউ ছেলের কথা ভাবো।

আর বলব না।

আজ খেতে বলছ না ?

—কথায়…কথায়…

মা আসন পেতে দেন, খাবার সাজিয়ে আনেন।

—তোমারটা আনলে না ?

রাধার সঙ্গে খাব। মেয়েটা গেরস্ত ঘরেরই। এসে ঝাঁটপাট দিল। তরকারি কুটে দিল। বেশ নরম মেয়ে।

—চুপ করে আছে ?

—কাঁদছে খুব, আমার কি হবে !

—সে কি বলা যায় ?

—মেয়েদেরই তো জ্বালা রে ! পথে ভাসে, জীবন নষ্ট হয়, এ সব কত হচ্ছে।

—দাদাও অমানুষ। কে ছেলে, কি বৃত্তান্ত, খোঁজ নেবে তো ?

—সত্যিই অমানুষ।

—এ কি ! আজ পায়েস কেন ?

মা ক্ষীণ হাসেন, তোর জন্মদিন। কোনোদিন তো···

—সবুজটা মিষ্টি ভালবাসে।

—দিয়েছি ওকে। আচ্ছা তপন !

—কি ?

—এ মেয়েটাকে বিয়ে করতে পারিস না ?

—না মা। আমার কোনো স্বাভাবিক জীবন হবে না। আমি ও সব চিন্তাই করি না।

—কালই যাবি ?

—হ্যাঁ, আর কাল সবুজ ওকে নিয়ে থানায় যাবে। ডায়েরি লিখবে। তারপর চলে আসবে।

—না, আমরা কি কালই যাব ?

তাই তো ইচ্ছে। ব্যাংকে খবর নিয়েছি ওরা লিখে দেবে, তাহলেই ওখানে হয়ে যাবে। আমরা গাড়িতে যাব মা।

কলকাতা, সেও গাড়িতে '

—নিশ্চয়।

—এই মেয়েটা।

-বাড়ি থাকবে। সবুজ নিয়ে যাবে। থানা থেকে চলে আসবে, সেটা কোনো ব্যাপার নয়। রাধা !

রাধা এসে দাঁড়ায়। পালটে অন্য কাপড় পরেছে, চুলে বেণী বেঁধেছে, সেও সিঁথি উলটে নাকে একটা ঝুটো নাকছাবি। চোখ ও মুখ কান্নায় স্ফীত।

—আমাকে থানায় পাঠাবেন না।

—যেতেই হবে। কেন এসেছ, কি ভাবে এসেছ, আমার কাছে কি ভাবে এলে, সব কথা বলবে। এখানে তো তোমাকে রাখতে পারি না বরাবর। আর ভাল কোনো ব্যবস্থা না হলে পাঠাতেও পারি না

কোথাও। যেমন বলছি, তাই করো।

—এখানে মায়ের কাজের লোকও তো লাগে। আমি থাকতে পারি।

আমি রাখতে পারি না। অন্য অসুবিধে আছে।

রাধা আস্তে সরে যায়। মা বলেন, পড়াশোনা তো ক্লাস সিক্স। হাসপাতালে আমার কাজেও ঢোকানো যায়। সুমনাদের কাজকর্ম করে ওখানে থাকবে।

—সে চাইলে করতেই পারে। তুমি দেখো। কিন্তু এখানে থাকা চলে না।

তুই যা বলবি, ও তাই করবে।

—আমাকে চেনে কতটুকু ?

ভরসা করে।

ভুল করে মা। আর, যদি কোনো কাজে যায়, এখানে যেন যায়-আসে না। বললাম তো, কে কবে কি করে বসবে···আমি যাই।

—অনেক দিন বাদে এলি।

—হ্যাঁ।

এই আসার ব্যাপারটাও যাতে বন্ধ হয়ে যায়, তপন তো সেই চেষ্টাই করছে। বিরতিগুলো বাড়বে মা, বাড়তে বাড়তে স্থায়ী হয়ে যাবে। যেতেই হবে। লাইনে নামলে তপনরা চিরস্থায়ী থাকে না।

তপনরা অন্য লোকদের হাত। যে হাত ছুরি চালায়। যারা তপনদের মালিক, তারা নিরাপদে থাকে। তাদের সব থাকে। রেণু বউদি, বউদির মেয়েরা, ঝকঝকে বাড়ি, পবিত্র নিরামিষ ভোগ, সকালে মাসাজিস্ট, পরিমিত আহার, সভাসমিতি, ধবধবে জামা-কাপড়।

তপনদের গায়ে রক্তের দাগ লাগে। এও ক্যানসার মা। ওদের দরকার তপনদের, তপনদের দরকার ওদের। ওরা যখন অসংখ্য, তপন অগণিত টাইগার, অজস্র রঙিন ম্যানুফ্যাকচার করে ফেলবে। সেদিন তপনরা ফালতু হয়ে যাবে, অথবা সেদিনও তপনরা জরুরি থাকবে। ভবিষ্যৎটা অজানা মা !

তপন বলে, আসি।

ব্যাঙ্কের লোকেরাই শ্যামবাজার ব্রাঞ্চে ইনট্রোডাকশন লিখে দেয়।

সব তুলে নেবেন ?

- না, হাজার দশেক রেখে।

- আমরা মার খেয়ে গেলাম।

এ অ্যাকাউন্টও বাড়বে।

দাঁড়ান, এটাও জয়েন্ট করে নিই। তাহলে আর মার অসুবিধে হবে না।

তপনের বুক থেকে ভার নেমে যায়। তার যাই হোক, মা কষ্টে পড়বে না।

জীপে যাবি ?

সবচেয়ে ভাল গাড়ি মা।

জীপে কলকাতা পৌঁছতে বারোটা। যানজটে ব্যাঙ্কে পৌঁছতে একটা। অ্যাকাউন্ট খোলা হয়। তারপর তপন চেকটি জমা দেয়। পাঁচশো ক্যাশ দিয়ে খাতা খুলে পাঁচ লক্ষ আশী হাজার ছয়শো সাতাত্তর টাকার চেক জমা দিতে ভেতরটা নির্ভার হয়ে যায়।

—আর তোমার ভাবনা রইল না মা !

না, তুইও ভাবনামুক্ত।

—বেলা হয়ে গেছে। চলো, কিছু খাবে ?

তুইও তো খাবি ?

দই, মিষ্টি…

সেই ভাল।

খাওয়া হলে তপন বলে, চলো তোমায় ঘুরিয়ে নিয়ে যাই এক জায়গায়।

—রেবার বাড়ি ?

—সে তো আমি জানিই না, যেতেও পারব না। শ্যামল বা রেবা চাইবে না।

—ওরা তোকে চিনল না।

—হয়তো ওরাই চিনেছে। যাক গে, চলো।

দক্ষিণেশ্বর দেখে মুগ্ধ হয়ে যায় মা। মাকে একটি ছোট মেয়ের মতোই হাসিখুশি দেখায়।

—"রানী রাসমণি" সিনেমায় যেমন দেখেছি, ঠিক সেই রকম

রে তপন!

—তাই তো হবে মা। ঘুরে ঘুরে দেখ। ফিরতে হবে আমাদের। দেখছ, কি ভিখিরির ভিড়! কি হলো, পয়সা দেবে? এই নাও, দাও।

—পঞ্চবটি, নহবতখানা, মন্দিরের দেবী, ঠাকুরের ঘর, সব দেখা হয় ঘুরে ঘুরে।

—গঙ্গাই বা কত সুন্দর এখানে! বলতে কি, এলে পরে মন জুড়িয়ে যায়।

—কোনোদিন দেখনি তুমি?

—কবে দেখলাম? কে দেখাবে? ওখানে পড়ে আছি তো ওখানেই পড়ে আছি। আর, তুই যখন ছিলি না, আমি তো কোথাও যাইনি। সংকটা কালীর ওখানে পড়ে থাকতাম। যাক, আজকের কথা আমার খুব মনে থাকবে।

বড় এক বাক্স সন্দেশ নিয়ে পুজো দেয় মা।

—বাড়িতে দেব। এখন তো সবুজ, বীরু, এরাও আসে। মেয়েটা আছে, তোর বাবা···

নিশ্বাস ফেলে মা। যেন অসহায়ভাবে বলে।

সে এখন অন্য মানুষ হয়ে গেছে।

—হলেই ভাল।

হ্যাঁরে, এই যে বাড়ি হবে, তোর বাবাও যাবে তো?

—সব তোমার ইচ্ছেমত হবে। একলা তাকে ফেলেই বা যাব কোথায়? এখন টাউনের ব্যাঙ্কে টাকা ফেল। টাকা তোল। এখানে যে টাকা, তা হয়তো বাড়বে। তবে যা বললাম, তাই। বাড়ি তোমার, তোমার পরে ওরা পাবে।

—ওরা অরাজী হবে না। হবে কেন?

—বাকি টাকা? তার সুদ তোমার আয়। তোমার পর ওদের যাকে যা দেবে দিও। সবাই এখন তোমার, তুমিও যত্ন পাবে ওদের কাছে। আর মা!

—বল্?

—টাউনের ব্যাঙ্কের টাকা থেকে তুমি যেমন বোঝ, কুশদের দিয়ে দিও। ওই চারটে ছেলে আমাকে খুব দেখে।

—দেব, যা বলবি তা করব, তপন! এখন তো টাকা আছে তোর। কোথাও চলে যেতে পারিস না?

— না, মা। সে চেষ্টা করলে ভবানীবাবু যাবে পুলিশে। তারপর…চলো, যাওয়া যাক। ভেবো না।

—"ভেবো না"। কত সহজে বলিস!

—ভেবে কি করবে? তোমার-আমার হাতে কি আছে?

সমগ্র ব্যাপারটি শুকুবাবুরা লক্ষ্য করে যায়। ভবানীবাবু বলে, ওই মেয়েটা এল, তপন টাকা সরাচ্ছে, সন্দ কর কিছু?

— মেয়েটার সঙ্গে ওর কিছু নেই।

টাকা সরাচে কেন?

—মাকে দিচে।

—অন্য কোনো মতলব? ভোগে যাবে?

কি করে জানব? কতায় বলে মন, না মতি! তবে এ কতা দাদা জানে যে পালাতে পারবে না। আমাকে অনেকবার বলেচে।

পালিয়ে পুলিশের পোটেকশান নিতে পারে।

—মনে হয় না। ও কোতাও যাবার লোক নয়। মন-গুমরে থাকে, একলা থাকে। মদ খায় না, মেয়েছেলেদের আমল দেয় না। ও এক জাতের ছেলে। সে সময়ে একবার ডাকলে সুমনা নাস চলে আসত।

এরাই হলো ডেনজারাস, বুজলে? বয়সের ছেলে তুই, মদ খা, ফুত্তি কর, কিছু করে না?

—না, কিছুই না।

—টাউনে হাওয়া কেমন?

—গরিবগুরবোর কাচে তো ভগবান। আর, পাপিয়ার মেয়েটাকে বাঁচাতে চেইছিল, সুমনার ইজ্জত রাকল, এ মেয়েটাকে সাহায্য করচে। এ সব কতা তো বাতাসে ওড়ে, তাই না? অভীক আর সোমজিৎও ওকে বেশ ইয়ে করে। টাউনে কতাই রটে গেচে, সুবিচের পাচচ না, ওর কাচে যাও। হাসপাতালে বেলেল্লাগিরি বন্দ করে দিল।

—তোমারও দেকচি ভক্তি হয়েচে।

— বলেচে, এখন বড় বিজনেস করা চলচে, ছুটকো কারবার বন্দ করলে মানুষ খুশি হবে, মন্দগুলো মনে রাখবে না। আমাদের ভদ্দর হতে হবে।

—বলেচে!

ওর কতাতেও লোক বাড়ি বুকিং করেচে। সাইটে লোকাল লেবার লাগালে তারাও খুশি হবে।

—দেকা যাক। তবে ধম্মপতে পয়সা এলে সবাই খুশি হয় না। অন্য পতে হটাৎ পয়া আসে। সে পয়সা উড়েও যায়, তবে তা আর মনে রাকে? মানুষ ভোলে খুব তাড়াতাড়ি।

তাও সত্যি।

মোট কতা, ওর ওপর নজরও রাকতে হবে। মা বলে এত টান ওর, আগে জানিনি।

টাইগার বলে, মা আর ছেলে! টান থাকবে না?

তুমি যদি একানে চলে এস, ব্যারাকবাড়ি?

হয়ে যাবে ব্যবস্থা। মাসিকে ঠিকে দিয়ে দেব।

—এ মেয়েটা কেমন?

দেকিনি।

— কে জানে, তপন ফেঁসে গেল কিনা!

— ও কোনোদিন ও-পতে যাবে না।

—মেয়েটার নাম কি?

—রাধা।

রাধা থানায় বসে বসে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। ও. সি.-র সময়ই হতে চায় না। যখন ওর সময় হয়, তখন ও ভয়ে ও উদ্বেগে কাঁটা হয়ে উঠেছে।

ও সি-র গলাটা খুব ভারি।

—নাম রাধা কর্মকার?

—রাধারানী কর্মকার।

—তবে "রাধা" বলেছ কেন?

—সবাই রাধা বলে।

—তেঁতুলবাগে বাড়ি?

—হ্যাঁ, বাবু।

—বাড়িতে কে আছে?

—দাদা।

—নাম কি?

—পবনচন্দ্র কর্মকার।

—বিয়ে হয়েছিল?

—হয়েছিল।

—থাকলে না কেন?

—সাত দিন যেতেই ফেরত দিয়ে যায়।

—আর যাওনি?

—সে তো বিয়ে করে নিয়েছে তারপরেই।

—ফেরত দিল কেন?

—দাদা সাইকেল দিতে পারল না!

—এ লোকের সঙ্গে আলাপ কেমন করে হলো?

রাধা সবই বলে গেল।

খুব অন্যায় করেছ ঘর ছেড়ে এসে।

বে' করবে বলল।

অমনি চলে এলে? নিন, লিখে নিন সব। এ লোককে যদি ধরা যায়, তাহলে?

—বে' করে তো করব।

—যত্ত সব ঝামেলা। তপনবাবুর কাচে গেলে কি করে?

—সবাই বলল, পারলে উনি পারবে।

—হ্যাঁ, উনি যেমন বলেন তেমনভাবে চলো। আমরা খবর পেলে তুমিও পাবে। দেখে তো মনে হয় গেরস্তঘরের মেয়ে। বেটাছেলে দেখলেই হেদিয়ে পড়লে কেন? বিয়ের নামে ধাপ্পা দিয়ে এখন কত মেয়েকে···তা জান না?

—জানি।

রাধার চোখ দিয়ে জল পড়ে।

—খবর আমরা তোনিবাগেও করব।

—দাদার কাছে পাঠাবেন না।

—যদি নিতে চায়?

—নেবে না।

রাধা মাথা নাড়ে। বলে, অমন কামারশাল জ্বলে দিল। আমি আর বউদি ধান ভানব, সিজাব, লোকের বাড়ি কাজ করব, কিছু দেখে না। নিজ রোজগারে খাই, তাতেও রাতদিন বলে, বসে খাচ্ছে, বেরো, বেরো।

—যাক গে, কোথাও গেলে থানায় জানিয়ে যাবে। কোথাও কেটে পড়ছ না তো?

—কোথা যাব? মা বলছেন, হাসপাতালে আয়ার কাজ করে দেবেন, তাই করব।

—মা?

—ওই বাবুর মা।

—তুমিও 'মা' বলছ? বেশ, বেশ! হ্যাঁ, খেটে খাবে, সেই তো ভাল। আচ্ছা, এসো!

ও. সি. বলেন, ওহে সামন্ত! তপনবাবুর ক্যান্ডিডেট, বুঝলে?

—তিনি তো সকলের উপকারই করে।

—তা করে। তিনি নইলে আমি ওই হাউসিংএ ফ্ল্যাট পাই? ছোট হলেও, সম্পত্তি একটা!

—আমিও চাইব একটা।

—শ্বশুরের অমন বাড়ি থাকতে?

—কোচবিহারে যাবে কে? এ তো কলকাতার কাছেই। মেয়েদের স্কুল, সব সুবিধে!

—দেখ!

রাধা যাতে একটা কাজ পায় সেজন্যে তপনের মা সত্যি খুব চেষ্টা করেন। তাঁকে অবাক করে দেন মেট্রন।

—হাসিদি, তুমি বলছ, এ আর বেশি কথা কি? নামটা লিখে নিই। রাতে ডিউটি করবে?

—ফিমেল ওয়ার্ডে দেবেন।

—থাকবে কোথায়?

—সুমনাদের বলি।

সুমনারাও রাজী হয়। তপনের মা বলে, ভালভাবে কাজ করো,

ডাক্তারদের নার্সিংহোমেও ডাক পাবে। কাজ যদি ঠিকভাবে করো···

রাধা ওর পায়ে মাথা রাখে। তপনের মার আবারও মনে হয়, তপনের জীবনটা স্বাভাবিক হবে না, হতে পারত।

তপনের মা বলেন, এর-তার সঙ্গে মিশো না, কথা বলো না। টাউন বড় মন্দ জায়গা।

—হ্যাঁ মা, মনে রাখব।

—বিয়ে করব বলে ভাঁওতা অনেকেই দেবে। সে কথা শুনো না। ও সব ভাঁওতা মাত্র।

—হ্যাঁ, মা।

কিন্তু সে কথা তো রাখতে পারে না রাধা। তপনকে খুশি করার জন্য খোঁজ চালাতে চালাতে পুলিশ ধরে ফেলে দেবা পাল, ওরফে স্বপন বিশ্বাসকে। রাধাকে নিয়ে যায় যখন, রাধা শিউরে ওঠে।

মেরে মেরে পুলিশ ওর চেহারা পালটে দিয়েছে। দেবা বলে, নামটা পালটেছিলাম মাত্তর। নইলে রাধা! সেদিনে আমার যে দুর্ঘটনা হয়ে যায়···

—কি হলো?

—মীরপলাশীর কাছে বসে অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল রাধা!

—কোথায় লেগেছিল?

—কোমরে, মাথায়, খুব লেগেছিল।

ও. সি. বলেন, মীরপলাশীর কাছে অ্যাকসিডেন্ট? কবে হলো? আর নাম বা পালটেছ কেন?

দেবা চুপ।

—দেখ রাধা! এ লোকের সবই প্রতারণা। চাও তো তুমি কেসও করতে পার এর নামে।

—আমি পারব না।

তপনবাবুকে বললে অবশ্য···

—তাঁকে আর জ্বালাবেন কেন?

—জানানো কর্তব্য। যা হোক, একে তুমি চিনেছ তো? সেটা বলো।

—হ্যাঁ···চিনেছি···তুমি আমায় বে' করবে বা বললে কেন? এতদিন ধরে মিছে বলে বলে···নামও মিছে?

দেবা নিরুত্তর।

—আমার বাড়ির আশ্রয় গেল! বাবু, আপনি তপনবাবুকেই বলুন। তাঁর যা বিচার হয় মেনে নেব।

তপন খুব অবাক। কি বলছ তুমি? এ বিয়ে করলে বিয়ে করবে?

যদি ঠিক পথে চলে···

মন থেকে বলছ?

—রাধা! হ্যাঁ বলো রাধা। তুমি যেমন বলবে তেমন চলব। আপনি সার, আমাকে একটা সুযোগ দিন। কুপথে গেছি কুপরামর্শে। এখন থেকে আমি ভাল হব।

-বিশ্বাস তো হয় না।

রাধা সমিনতি চোখ তোলে।

- নাম ভাঁড়িয়েছে, তোমার টাকা নিয়ে সরে পড়েছে, ধাপ্পা দিয়েছে, সেদিন মীরপলাশীতে কোনো দুর্ঘটনা হয়নি। হয়েছিল আট মাস আগে। সব জেনেশুনেও ওকে···

রাধা বলে, টাউনে থাকলে আপনার ভয়ে ঠিক থাকবে।

আমি কি করে চোখ রাখব?

দেবা বলে, আপনাকে সবাই জানে সার।

—বিয়ে করে খাওয়াবে কি?

—ইলেকট্রিকের কাজ করব। যন্তরপাতি আছে।

—বাড়ি কোথায় তোমার?

—চাকদা। বাড়িতে যাই না।

—টাউনে চেনে কে?

—কন্টাক্টার সামন্তবাবু। দেবা নামে চেনে।

—রাধা যা ঠিক করো।

—আর কে বে' করবে আমায়?

—কাজ তো করছ।

—কাজ ছাড়ব না। বে' হলেও কাজ করব।

—দেখ! তোমার যখন এত ইচ্ছে। থাকবে কোথায়?

দেবা পাল কোমর থেকে টাকা বের করে, একটা রূপোর চেন।

—এই ওর টাকা। বে' করব বলেই তো খুঁজে খুঁজে এলাম। শেষে থানায় গেলাম। তা আমার নামে লিখে বসে আছে তা জানি ?

—তুমি যাওনি। পুলিশই ধরেছে তোমায়।

—হ্যাঁ, সার।

রাধা বলে, সত্যি কথা কি জিবে আসে না ?

—এরপর কোনো বদমায়েশি করলে জানই চলে যাবে জেনো।

দেবা শিউরে ওঠে।

—না, পা ছুঁয়ে বলচি।

—থাকবে কোথায় ?

—হাসপাতালের পেছনে বস্তিতে।

—সেখানে ?

—নয় হরিজন বস্তিতে। ঘর একটা পাব।

—রাধা ! চিন্তা করে দেখ।

—কি চিন্তা করব বাবু ? এ আমার নিয়তি। কপালে থাকে, এ লোকই ভাল হবে, সংসারী হবে।

—দেখ !

এ ভাবেই বিয়ে হয়ে যায় রাধা কর্মকার ও দেবা পালের। টাউন বলতে থাকে, এ ভাবে একটা মেয়ের বিয়ে দেওয়া, এ তপনই পারে। এ সব মেয়ে তো ভেসে যায়। এ মেয়ের একটা দিশে হলো।

রাধার দিশে হলো কিনা, সেটা তপন বোঝেনি। ওই লোককে বিয়ে করলে কি কোনো দিশা মেলার কথা ?

তবু বিয়ে হয়। সুমনারা দেয় রান্নার স্টোভ, বাসন-কোসন। তপনের মা দেন কাপড়, জামা, সায়া, চটি। তপন মাকে বলে, আর কিছু নয়। ওর চেয়ে অনেক কমে মানুষ সংসার শুরু করে।

—সে তো বটেই।

হাসপাতালের পেছনে বস্তিতে রাধা আর দেবা পাল জীবন শুরু করে। দেবাকে দেখা যায় সামন্তবাবুর আপিসে। সামন্তবাবু দেবাকে বলে, তপন এখন এখানে বস্। কোনোরকম টিক্‌রমবাজি

কোর না। ও ছুরি চালিয়ে দিলে পুলিশ চেয়েও দেখবে না।

--করব না সার।

—তোমার এটা কত নম্বর বউ?

—রাধা জানে না সার। দয়া করে···তারা কি থাকল কেউ? সব ভেগেছে। তাতেই গেঁয়ো মেয়ে···

—ভেগেছে, না বেচে দিয়েছ?

—না সার, কালীর কিরে···

—যাও, যাও। তবে আমি ওর খারে যেন না পড়ি।

—না, সার।

- অনেক লোচ্চামি তো করলে। এবারে···

--হ্যাঁ, সার!

॥ ছয় ॥

কিন্তু এর মধ্যেই মলয় এসে পড়ে শহরে। তপনকে বলে, ভবানীদার কাজে খড়গপুরে ছিলাম।

মলয় আরো শক্ত ও বলিষ্ঠ হয়েছে। চোখের চাহনি ও কথা-বার্তা এখন খুব রুক্ষ। কোথায় একটা আত্মবিশ্বাস এসেছে ওর।

শুনেছ বোধহয়, নতুন প্রজেকটে আমি থাকছি।

- শুনেছি।

--হাউসিং সুপারভাইজ করছ তুমি! দেখ এখানেও ফিট করতে পার কিনা।

একটাই শর্ত। নো মাল সরানো। সেটা তুমি দেখবে!

-- ও, গ্যারান্টি, গ্যারান্টি।

কাজটা খুব ভাল করতে হবে মলয়। যাতে কোম্পানি দাঁড়িয়ে যায়।

নিশ্চয়। টাইগার কি এখনো···?

- হ্যাঁ, তবে চলে আসবে।

শুনেছি টাউনে তুমি ভগবান হয়ে গেছ।

কি যে বলো! থাকবে কোথায়?

দেখি! তুমি কি নাইফিং ছেড়ে দিলে?

—বলতে পার।

—অনেকদিন বাদে এলাম, ঘুরে আসি।

—মেয়েদের নিয়ে ঝামেলাও বন্ধ।

—আমরা সন্ন্যেসী হয়ে যাচ্ছি ?

না, গুডউইল করছি !

—যা বলো ! তুমিই তো বস্।

মলয়কে এনেছে ভবানীবাবু। অর্থাৎ তপনকে মানাতে পারছে না। একজন অনুগত বস্ চাই। যে ভবানীবাবুকে কড়া কথা বলবে না, ভবানীবাবুর নকশা বুঝবে না।

তপন সবুজকে বলে, তোরা খুব হুঁশিয়ার থাক্। টাইগারের চেয়ে এ অনেক খতরনাক লোক।

—তোমাকে কি করবে ?

মুখোমুখি আসবে না।

—তুমি ভেবো না।

আমি ভাবছি না।

কিন্তু দুদিন বাদে সকালের খবরে তপনকে ভাবিয়ে তোলে। সবুজ সাইকেল নিয়ে দৌড়য় সাইটে।

—আজ সকালে কাজে যায়নি রাধা। হাসপাতালে নয়, নার্সদের কোয়ার্টার্সে নয়।

—হয়তো ঘরে আছে।

—তারা দুজনেই নেই। ঘর খোলা, সব পড়ে আছে।

—তাহলে ?

—নেই।

দুজনেই গেছে যখন, ভাবনা কি ? সামন্ত কি বলে ?

সামন্ত বলে, সে তো কাজে আসছে না। ও কাজে লেগে থাকার লোক নয়। এর আগেও দুটো বিয়ে করেছে। তারা নাকি চলে গেছে। আমি মনে করি, দেবাই কিছু করে থাকবে।

—আপনি আগে কিছু বলেননি তো ?

আমার কাছে তো এল বিয়ের পর। কাজের লোক, কাজ দিয়ে সম্পর্ক। তার বাড়িতে কি করছে তাতে আমার কি ? আপনি বা ভাবছেন কেন ? ভাল বুঝে বিয়ে দিলেন, ব্যস, কাজ খতম।

—আমি দিইনি। সে করতে চেয়েছিল।

—তবে তো ফুরিয়েই গেল। সাবালিকা মেয়ে, কচি খুকী তো নয়। ভাববেন কেন?

মাও বলে, আর কেন ভাবিস?

—বিয়ে হয়ে খুশি হয়েছিল?

—খুব। স্বামীকে সে সেবা করত। বিয়ে করে যেন ধন্য করে দিয়েছে। এই তো গত শনিবার সংকটা কালীর পুজো দিল। বলল, রোজ বাজার করে আনে, খুব দেখে ওকে।

—কোথায় যেতে পারে?

—কেমন করে বলব?

রাধা বড় বিশ্বাসে বলেছিল, এ আমার নিয়তি!

—কি করে ওকে বিয়ে করল?

—বিয়ে ঘরসংসারের আকাঙ্ক্ষা যে খুব! একবার বেরিয়ে এসেছে যে মেয়ে, তাকে কোন ভাল ছেলে বিয়ে করত বল্? মেয়েদের অবস্থা বড় খারাপ তপন।

—দুজনে চলে যাবে, এমন তো কিছু হয়ওনি।

—ভেবে কি করবি, বল্?

কয়েকদিন টাউনে আর কোনো কথা থাকে না। এমনও শোনা যায়, তপন রাধাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল।

ও. সি. বলেন, দেখুন কোথাও লাশ মেলে কিনা। লোকটা তো শুনেছি আগেও এমন করেছে।

—বারবারই স্ত্রী চলে যায়?

—ও তাই বলে। কি করে জানা যাবে? স্ত্রীরা স্বামীকে ছেড়ে পালায়, এটাও তো হচ্ছে এখন।

এ সব কি এখনি হচ্ছে?

হ্যাঁ, হঠাৎ সমাজ ভেঙেচুরে বদলাচ্ছে। ওপরতলায় পারমিসিভ সোসাইটি। নিচে তার প্রভাব পড়বে না! মেয়েরাও জেনে গেছে তাদের বাজারদর আছে।

—আপনি কি পুলিশ-জীবনে ভাল কিছু দেখেননি?

—তাও দেখেছি। সৎ মেয়েকে স্বামী বেচে দিচ্ছিল, স্ত্রী সৎ-মেয়েকে বাঁচাতে স্বামীকেই খুন করে।

— কি শাস্তি হলো ?

—জেল হলো। তা, বাচ্চাটাকে নিয়েই জেলে গেল।

—আশ্চর্য তো !

—উপসংহারটা তেমন নয়। জেল থেকে বেরোল, বছর আটাশ বয়স তখন। মেয়েটাকে নিজেই বেচে দিল, নিজে ভেগে গেল এক-জনের সঙ্গে।

—রাধা তেমন ছিল না।

—গণ্ডগোল ছিল। স্বামী বাইরের লোক আনত, রাধা চেঁচাত।

— আমাকে জানায়নি কেন ?

—স্বামীর জানের মায়া করত।

—হ্যাঁ। আমাকেও বিশ্বাস পায়নি।

— ভয় পেয়েছে।

—দেবাকে এত সাহস জোগাল কে ?

—ভুলে যান তো ওদের কথা। এমনও তো হতে পারে, আপনি ওর বিয়ে দিলেন, আপনার ওপর খারেই কেউ…এটা ট্র্যাপও হতে পারে তপনবাবু।

—আপনি তো সব বলবেন না।

—সবকিছু শান্ত এখন, শান্তই থাকুক।

—খবর আমি বের করব। রাধা কোনো পার্সোনাল ব্যাপার নয়। কিন্তু সে আমার ওপর ভরসা করেছিল। আর মেয়েছেলে নিয়ে হেঁকড়বাজি আমি বরদাস্ত করব না।

তপনকে বিস্মিত করে খবরটা আনল সুমনা।

—আপনি ?

সুমনা একটা কাগজ এগিয়ে দিল। বলল, আমি কিছু বলতে পারব না। কি ভাবে জেনেছি, তাও নয়।

—এ কি ? রাধাকে বেচে দিয়েছে দেবা ? রাধা এখন ব্যারাকবাড়িতে ?

—হ্যাঁ, মলয়বাবু দেবাকে তিন হাজার টাকা দিয়েছে। এ কাজ দেবা আগেও করেছে।

—রাধা পালায় না কেন ?

—নতুন বাড়িতে যাব, বাড়ি দেখে আসবে চলো বলে নিয়ে

যায়। কিন্তু আমার মনে হয় অজ্ঞান করেই নিয়ে গেছে।

—দেবা!

—পুলিশে নালিশ, মার, দেবা তো সেটা ভোলেনি। সে সব অনেক কথা।

—আপনি জানলেন কি করে?

—বস্তির সবাই জানে। মলয়বাবুর ভয়ে বলেনি। মলয়বাবু না কি টাউনে আসছে, আপনাকে হটিয়ে দেবে।

—এসেছে বটে, আর বেরোবে না। ক'দিন হলো?

—দশ দিন তো বটেই। আমি অবশ্য সবটা জানলাম কাল।

ব্যারাকবাড়িতে! মলয় এত সাহস পেল কি করে?

ভবানীবাবু, ভবানীবাবু!

তাকে তপন যত কথা শুনিয়েছে, তেমন আর কেউ শোনায়নি।

ভবানীবাবু ভয় পেয়েছে?

তপন খুব তাড়াতাড়ি ক্ষমতাশালী হয়ে উঠছে? কিন্তু তপন অপমান হজম করে বেঁচে থাকবে না ভবানীবাবু, মরবে, তবে মেরে মরবে।

টাউনে আর কে কে জানে? কতজন তার কাছে চেপে গেছে সব কথা?

ব্যারাকবাড়ি! টাইগার! মাসি বসে থাকে। একেক ঘরে একেক মেয়ে।

তপন বাঘ হয়ে গিয়েছিল।

—কুশ! সবুজ! ক্ষিতি! বীরু! আমি অ্যাকশানে যাচ্ছি।

কোথায়?

—ব্যারাকবাড়িতে।

—আমরা কি করব?

—বাঁচতে চাস তো পালা। আমার সঙ্গে এলে হয়তো মরবি। তোরা ইয়ংম্যান, টাউন ছেড়ে পালা। অন্য কোথাও যা, সুস্থভাবে বাঁচতে চেষ্টা কর।

সবুজ বলে, আমি তোমার সঙ্গে যাব।

—মরতে?

জীবনটা তো তুমিই দিয়েছিলে। বেঁচে নিলাম কিছুকাল।

আশ মিটিয়ে।

সবুজ মুখ তুলে হা হা করে হাসে। এতদিনে তপন ওকে একবারও এমন হাসি হাসতে দেখেনি।

—সবুজ!

—কি দাদা?

—সংকটা কালীর মন্দিরটা কি রং করেছে?

—কই, না তো?

তপন জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চায়। বিকেলের টাউন। পথে লোক, একদল বালক একটা ফুটবল হাতে ছুটছে। সাইকেলে ফিরছে কলকাতাফেরত আপিসযাত্রীরা। সোমজিৎদের ক্লাব থেকে গানের সুর আছড়ে পড়ে, "এসো মুক্ত করো, মুক্ত করো, অন্ধকারের এই দ্বার।"

কেমন করে মুক্ত করবে ওরা, কেউ, যে কোনো প্রজন্ম? অন্ধকারের একটা দরজা খুললেই যেমন দেখা যায় আরেকটা আরো বড় অন্ধকারের দরজা? দরজাগুলো ভাঙতে ভাঙতে একদিন আলো এনে ফেলবেই কেউ। শুধু তপন তা দেখবে না। দেখে যেত যদি, তাহলে গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গেলেও কোনো খেদ থাকত না তপনের।

কেননা ভবানীবাবু বেঁচে থাকবে।

টাউন থেকে দূরে, কলকাতায় নিরাপদ দুর্গে, টেলিফোন ওঠাবে, যোগাযোগ করবে।

কিসের জমানা বদল? ভবানীবাবুরা তো থেকেই যাবে, আর তিলে তিলে কিনে নেবে প্রতি ধূলিকণা, ঘাস, টাকা রাখবে হাজার বেনামে। ওরা এখন থিংকিং বিগ। সঙ্গে অনেক বলশালী লোক। ছোট টাউনগুলো খেয়ে নিয়ে কলকাতাকে খেতে শুরু করবে।

ভবানীবাবুকে ঝেঁকে দিলে খানিক জ্বালা মেটে, কিন্তু সেটা সমাধান নয়।

সমাধানটা কেউ বের করুক, কেউ।

তপন দূরে চেয়ে থেকেই বলে, যদি পালটে না থাকে, তাহলে চলে যাস পেছনে দ্বাদশ শিবমন্দিরে।

—ভেঙে গেছে।

—ভিতরে গায়ে দেখবি আমরা লোহার শিক দিয়ে নাম লিখেছিলাম চম্পক, সৌরভ, তপন, শ্যামল, কাজল। অনেককাল আগে। ক্লাস সেভেনে পড়তাম।

—এ সব কথা বলছ কেন ?

—কেউ জানে না, তোকে বললাম। আর···

—কি ?

—চামেলিকে বলিস, ভরতকে আমি মারতে চাইনি, ভরত অ্যাটাক করেছিল। সেদিন একজনকে মরতে হতো। আফশোস, ভরত মরে গেল।

—এ সব কথা বলছ কেন ?

—মাকে বলবি, টাউন ছেড়ে চলে যেতে।

—আমার কষ্ট হচ্ছে।

—কষ্টের কি আছে ? তোদের তেমন ব্যবস্থা করতে পারলাম না। এই অ্যাটাচিটা ধর্। সোজা নিয়ে গিয়ে মার কাছে দিবি। এটা তোদের চারজনের। বলবি ব্যাঙ্কে ফেলে দিতে।

—ভবানীবাবুর লাস্ট পেমেন্ট না ?

—প্রমাণ করুক। পারবে না।

—তুমি কি ভাবছ বলো তো ?

—কিছু না। কার শেষ যে কি পথে আসে সবুজ ! যা, ঘুরে আয়। কাজ আছে।

না, কোন সূত্র ধরে শেষটা আসবে কার জীবনে, কে বলতে পারে ! মলয় এ জন্যেই এসেছে ? আসুক। রাধা···চোখে কাতর মিনতি···দেবাকে নিয়ে ঘরসংসার করবে···কিন্তু তপন যাকে আশ্রয় দিল, তাকে বেচে দেবে দেবা, কিনে নেবে মলয়, মাঝে থাকবে টাইগার ? তারপর তপনকে আর মানবে কে ?

—বীরু ! কুশ ! ক্ষিতি !

ওরা এসে দাঁড়ায়।

—তোরা যাসনি এখনো ?

বীরু ঘাড় ঝাঁকায়।

—যাবি না ?

—তোমার সঙ্গে যাব।

—চমৎকার ! মরতে চাস ?

ওরা নীরব।

—চলে যা, সরে পড়। মলয় আসছে। ও তোদের আগে খাবে। পুলিশ যেখানে দেখবে, সেখানে ফেলে দেবে। মার কাছ থেকে টাকা নিবি, সরে পড়বি।

—কোথায় ?

তপন ওদের অপরিচিত, রুক্ষ গলায়, চাপা গর্জনে বলে, আজ রাতে যাচ্ছ মার কাছে। এক ঘন্টা বাদে। টাকা নিচ্ছ। তারপর এ টাউন ছেড়ে যাচ্ছ। বিহার যাও, ওড়িষা যাও, যেখানে ইচ্ছে যাও। ক্ষিতির কোনো ভগ্নীপতি আছে রাঁচি, সেখানে যাও। জানবে নিজের জীবন নিজের। যে কোনো কাজ করে খাও, না গেলে মরবে।

—তুমি থাকতে ?

আমিই যদি না থাকি ?

কথাটা বুঝতে ওদের সময় লাগে।.

তপন নিচু, আন্তরিক গলায় বলে, তোদের তো শিখিয়েছি সব। এ লাইনে সবাই টেম্পোরারি। আমি টাইম বুঝেই তোদের বলছি। চলে যা। বেঁচে থাক। ও টাকা বিরাট টাকা নয়, তবে ছোট কাজকারবার করে বেঁচে থাকতে পারবি। চলে যা।

—তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না ?

তপন ঈষৎ হাসে, সে এখনি বলা যাচ্ছে না বীরু। আমি অনেক ভেবেই তোদের যেতে বলছি। তোরা তো জানিস আমি ফালতু কথা বলি না।

—শঙ্কুবাবুকে বলে যাব ?

—কাউকে বলবি না। সাইকেল নিবি, আমার বাড়ি যাবি, মা টাকা দেবে, সরে পড়বি।

—সবুজ কি করবে ?

—সে যাবে না। কথা শুনছে না। তোরা শোন। আর যা করিস, লাইনে যাস না।

ওরাও চলে যায়।

তপন সেফ খোলে।

সবুজ ফিরে আসে।

—সব ঠিকমত বলেছিস ?

—তুমি করেছ কি ? অ্যাটাচি দিলে, ওতে বিশ হাজার টাকা !

—চোতা কাগজ ! একেক জনকে বিশ-বিশ দিতে পারতাম ! টাইম তো পেলাম না । সবুজ ! এখনো ভেবে দেখ্ ।

—দেখেছি ।

আজকের জন্য মোটর সাইকেলই প্রশস্ত । টাউনের রাস্তা পিছনে সরে যেতে থাকে ।

—তপনদা ! ব্রেক ।

সামনে সোমজিৎ, অভীক, নন্দিতা, বাবুল । ওদের চোখে বিস্ময় । তপন বলে, সরি !

টাউনের রাস্তা পিছলে সরে যাচ্ছে । এইখানটায় চম্পক পড়েছিল । আলোকবর্ষ আগে । কোটি কোটি বছর আগে । এই পথ দিয়ে রেবা চলে গেছে শ্যামলের কাছে । আলোকবর্ষ আগে । এই জায়গায় তপনের বাবা মদ খেয়ে বেঁচে পড়ে থাকত । তপন বাবাকে তুলে নিয়ে যেত । এই মাঠে তপনরা ভারতের বাবা ধানুর তৈরি ঘুড়ি ওড়াত । হলদে মোমবাতির সঙ্গে সবুজ চাড়িয়ালের প্যাঁচ কষাকষি । টাউন পিছনে সরে যাচ্ছে । এই রাস্তা দিয়ে মা দিনের পর দিন, দিনের পর দিন হেঁটেছে আর হেঁটেছে । টাউনটা পিছলে সরে যাচ্ছে ।

এবার ওরা বিসর্পিল এক গলিতে ঢোকে । তপন সবুজকে বলে, বোম ফাটাবি, তবে দোকান আর মানুষ বাঁচিয়ে । ব্যারাকবাড়ির প্রতি জানলায় আলো । পানের দোকান থেকে শোনা যায় রেকর্ডে, "দিল না করো জখম ও বেদরদী বালম ।" মোটর সাইকেল থামে ।

—সবুজ, ওই ধোবিখানার মাঠে বোম মার্ ।

শব্দ, ধোঁয়া । ত্রস্ত জনতার চীৎকার । ঝপাঝপ দোকান বন্ধ হতে থাকে । মানুষ পালাচ্ছে ।

তপন ঢোকে রিভলভার বাগিয়ে ।

—মাসি কোথায়, মাসি ?

একটি মেয়ে একটি ঘর দেখিয়ে দিয়ে পালায় । তপন দরজায় লাথি মারে ।

মাসি আর সামন্তবাবু । তপন মদের বোতল ফেলে দেয়, গেলাসগুলোতে লাথি মারে । মাসিকে বলে, রাধা কোথায় ?

—রাধা···কে বাবা ?

—যাকে মলয় এনেছে।

—অ! রানী···সে···সে···সাত নম্বরে। দোত্লায়···

—আজ বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে যাব।

—হোতা···মলয়বাবু···বসে আচে।

দরজার পর দরজা লাথি মারতে মারতে যায় তপন। পালাও সব, বেরোও, এ বাড়ি আজ জ্বলবে। না, চীৎকার নয়। মেয়েরা বেরোতে থাকে, পুরুষরা।

—সবুজ, আবার।

বোমা ফাটে আকাশ দীর্ণ করে। ব্যারাকবাড়ির অন্য অংশ থেকেও লোক বেরোতে থাকে। সবুজের মনে আশ্চর্য আনন্দ হয়। কই, ভয় করছে না তো ?

সাত নম্বরের দরজা ভেজানো ছিল। রাধা একটা হলুদ শাড়ি জড়িয়ে কাঁপছে। মলয় সামনে।

—মলয় !

সাবধান তপন, আমার হাতে রিভলভার।

—কাপড় পর রাধা।

—তপনবাবু গো, আমাকে বাঁচাও।

খবর্দার তপন, ওকে আমি কিনেছি।

—বটে !

মলয় রিভলভার তোলে, চালায়। কিন্তু সবুজ ওকে ছুঁড়ে মারে টিপয়টা। মলয়ের কাঁধ ছিঁড়ে যায়। তপন মলয়ের হাত মুচড়ে ভেঙে দেয়।

—চেম্বার চালাচ্ছ, বেইমান !

—বেইমান তুই। দীনুবাবুকে···

—দীনুবাবুর ওপর বড্ড ভক্তি তোর, তাই না ?

তপন হিংস্র হাসে।

—দীনুবাবুর কাছে যা মলয়। সে তোকে খুঁজছে।

মলয়ের চোখে আতঙ্ক।

—না তপন, না, না তপন !

—আগে যদি বলতিস ! ভেবেছিলি আমার জায়গা নিবি। বল্ ? রাধাকে ধরে···

—ভবানী···বাবু···বলে···ছিল···

—হলো না মলয়, ভেরি সরি।

ছুরি নেচে ওঠে। মলয়ের গলা দু ফাঁক। রক্তের ফোয়ারা ভিজিয়ে দেয় তপনকে। দাঁড়িয়ে তপন একটা লাথি মারে মলয়কে।

—দীনুবাবুর কাছে যা।

রাধা বিছানায় বসে। আতঙ্কে বড় বড় চোখ। সিঁড়িতে দুপ দুপ শব্দ।

সবুজ বলে, টাইগার!

—বোম আছে আর?

—একটা।

—রিভলভার নে।

তপন দরজা বন্ধ করে।

—তপনদা, দরজা খোল।

—তুই, আর সঙ্গে কে?

—তোমার খেল্ খতম তপনদা!

—কে খেলবে, মলয়?

—যেই খেলুক।

—মলয় গেছে দীনুবাবুর কাছে। তুমি কার কাছে যাবে টাইগার? ইরানী? ইরানীর ইমান ছিল।

—এ খেলায় বেইমানি বলে কিছু নেই তপনদা। আমি লাচার। আমি একা নয় তপনদা! বম্বা আর থাকু আচে।

তপন বলে, সবুজ! ওরা দরজা ভাঙবে তো ওটা মারবি।

—হ্যাঁ, দাদা।

—ভয় করছে?

—না।

রাধা কঁকিয়ে ওঠে। কেননা দরজায় ওরা দমাদম লাথি মারে।

—ভয় পেও না রাধা। দেখছ না, দেবা তোমাকে কিভাবে বেচে দিল?

—তকন আপনি…আশ্রয় দিলেন…

তপন নিশ্বাস ফেলে।

—আমি বুঝতে পারিনি।

—নয় কোথাও নিয়ে যেতেন!

—তুমি দেবাকেই চেয়েছিলে…

—একটা সংসার···তখন কি জানি ?

—চুপ করো। ওটা কি, বাথরুম ?

—না, পাশের ঘরের দরজা।

—পেছনের দরজায় বেরোলে ?

বারান্দা।

তপন ওকে ঠেলে বারান্দায় বের করে দেয়। চাপা গলায় বলে, পালাও। দরজা বন্ধ করে দেয়। রিভলভারে ছ'টা গুলি। তপন একদা কিনেছিল। ছুরিটা তুলে নেয়। সবুজকে চোখের ইশারা করে। দরজার হুড়কো নামিয়ে দুজনে দুপাশে সরে যায়। লাথি মেরেছিল বলে টাইগার হুড়মুড়িয়ে এসে পড়ে মেঝেতে।

ওর চুলের ঝুঁটি ধরে তোলে তপন। টাইগার, তোর পেছন থেকে···

বম্বা আর থাকু গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে ঢোকে। সবুজ গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তেই দরজা দিয়ে বেরোয়। টাইগার ঝটকা দেয়। তপনের কাঁধে গুলি। তপনের ছুরি টাইগারের তলপেট চিরে দেয়। কপালে লেগেছে ? চোখে রক্ত কেন ? তলপেটে গুলি। তপন বলে, সবুজ ! টপকা, টপকা। আমি খায়েল, আমার কথা ভাবিস না।

বম্বা ও থাকু নিমেষের জন্যে হাত তুলে স্তব্ধ। তপন ছুরি ছোঁড়ে। বম্বা টাল খেয়ে ঘুরে পড়ে। সবুজ ছুটে আসে। বাইরে উঠোনে বোম ফাটার শব্দ অতি ভয়ানক। ছাত ফেটে যায়। ঘরে বারুদের গন্ধ, ধোঁয়া।

সাইরেনের শব্দ কাছে আসে। সবুজ ও থাকু পরস্পরকে গুলি করে।

তপন যেহেতু তখনো নিশ্বাস নিচ্ছে, সেহেতু তাকে হাসপাতালে নিতেই হয়। ও. সি. বলেন, বাঁচবে ?

—এ রকম ইনজুরি নিয়ে ? অসম্ভব মাথায় গুলি। তলপেট রিপ্‌ড ওপেন, কাঁধে গুলি। হেমারেজেই চলে যাবে।

—বাইরে ভিড় দেখেছেন ? টাউন ভেঙে পড়েছে।

অবশেষে হেঁটে আসেন এক শীর্ণ, কালো প্রৌঢ়া। মাথা উঁচু করে।

—আমি ওকে দেখব।

—আপনি কে ?

—তপনের মা। ও তো আর বেশিক্ষণ নেই। ও. সি. বলেন, ছ'টা বডি। তিনটেকে তপন ফেলেছে।

—ও পারত। মার্ডারার তো!

—নাউ হি কান্‌'ট বি ব্রট টু ট্রায়াল।

তপনের মা ঈষৎ হাসে।

—হাসছেন?

—আদালতে তপনকে তুলতেন। ও মার্ডারার। কিন্তু দারোগা-বাবু, যারা এই ছেলেদের দিয়ে মার্ডার করাল, করাবে, তাদের তো কিছু হবে না, তাই না?

ঘরে নৈঃশব্দ্য। বাইরে করিডোরে জমাট ভিড়। একপাশে অভীককেও দেখা যায়।

তপনের মা দরজার কাছে দাঁড়ান।

—আমার ছেলের হাতে ছুরি তুলে দেন ভবানীবাবু। এরা মারা গেছে, তপন মারা যাবে। কিন্তু আরো মার্ডারার আনবে ওরা! যে খুন করে সে নিশ্চয় আসামী। আমার ছেলে আজ যে খুন করেছে, সে একটা মেয়েকে কেনাবেচা বেশ্যার জীবন থেকে বাঁচাতে গিয়ে। চিরকাল মাথা নিচু করে থেকেছি টাউনে। আজকের জন্যে আমার কোনো লজ্জা নেই, কোনো লজ্জা নেই! কিন্তু দারোগাবাবু, যারা মার্ডার করায়, তারা তো ছাড়াই থাকল। সে বিচার কেমন বিচার? তপন একা মার্ডারার? ভবানীবাবু কি?

—আপনি চলে যান।

—জবাব আছে?

তপনের মা শুকনো চোখে, শুকনো হাহাকারে বলেন, ভবানী-বাবুরা মার্ডারার, কিন্তু তাদের কেউ ধরবে না।

সমবেত জনতা গুঞ্জন শুরু করে।

অভীক বলে, আপনি চলে যাচ্ছেন?

—হ্যাঁ। ওকে তো বাড়িতেই আনবে, আমি যাই। রাধা এগিয়ে আসে। বীরু, কুশ ও ক্ষিতি ওঁর সঙ্গে হাঁটে। মাথা উঁচু করে হেঁটে যান তপনের মা। দারোগা দেখতে পান, একজন মার্ডারারের মৃত্যুতে ক্রুদ্ধ নির্বাক জনতার মুখ। দেখতে পান, মার্ডারারের মা মাথা উঁচু করে হেঁটে যাচ্ছেন। তপনের মার কথায় পরিস্থিতিটা বিস্ফোরক হয়ে যায়।

———